

৫ম বর্ষ

উত্তরন

শারদ সংখ্যা

Growing SEED

Scanned by CamScanner

PH: (03822)235121
08730819772

Hotel Panchabati

DNV Road, Dharmanagar
North Tripura

Hotel,
Restaurant,
Conference Hall

AC- Rooms, Car parking

Scanned by CamScanner

উত্তরন

শারদ সংখ্যা ২০১৫

Gift Copy
NOT FOR SALE

Growing Seed, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা
ই-মেল : seedgrowing@gmail.com
ফেসবুক : facebook.com/growingseedinfo
লগঅন করুন : www.growingseedsociety.webs.com
টুইটার : @growingseed1

(বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় ম্যাগাজিন কতৃপক্ষের নয়।)

Scanned by CamScanner

UTTARAN
Edited by : Growing Seed
₹ 20

পঞ্চম প্রকাশ :
১৯-১০-২০১৫

প্রকাশ :
Growing Seed Printing Unit
চন্দ্রপুর, ধর্মনগর,
উত্তর ত্রিপুরা।

প্রাপ্তিস্থান :
জ্ঞানদা পুঁথিঘর, ধর্মনগর

মূদ্রক :
যাদব প্রিন্টার্স / অফসেট্
বাবুর বাজার, থানারোড
ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

অক্ষর বিন্যাস :
সুজিত দাস (মো: ৮১৩১৯৭৩২৩৭)

প্রচ্ছদ :
অনুপম ভট্টাচার্য্য

মূল্য :
২০ টাকা মাত্র

Scanned by CamScanner

বিষয়	ক্রমাঙ্ক	লেখকের নাম
অব্যক্ত	০১	বিধান চন্দ্র দে
মনে পড়ে	০৬	বিষ্ণুপদ দে
নেমেছে সন্ধ্যা	০৬	রত্নজ্যোতি চক্রবর্তী
হৃদয় কথা	০৭	শিউলি শর্মা
কিছু প্রশ্ন	০৮	দেবাশীষ দাস
ধর্মনগরের ইমদাদ মামা	১০	নরেন্দু ভট্টাচার্য
মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ	১৪	স্বপন ধর
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা	১৬	কৃপাময় চক্রবর্তী
বিজ্ঞানের টুকিটাকি	১৮	রূপম দেবনাথ
আমার তাতে কি ?	২০	দধিচী
খাওয়া - খাওয়ি	২২	নীহারেন্দু নাথ
তুমি আসবে	২২	রজত নাথ
নিস্তব্ধতা	২৩	দেবজ্যোতি আচার্য
মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস		
কি পাল্টে যাবে	২৪	ডঃ রণেন্দ্র চন্দ্র নাথ
রক্ত এবং রক্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য	২৫	দীপালোক ভট্টাচার্য্য
ধর্ম কি সত্যিই ধর্ম না অধর্ম	২৬	অনুরাগ দেব
ভাবান্তর	২৭	রঞ্জিত পুরকায়স্থ

Scanned by CamScanner

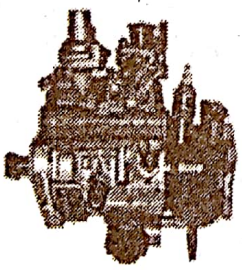
BOSCH
Invented for life

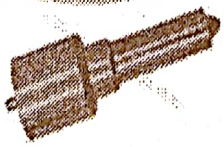
M/S. Assam Diesel

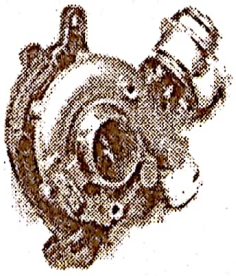
MICO
Bosch Group

TRTC Road, Rajbari, Dharmanagar
North Tripura, PIN: 799253
Mob: 9862618483, 8414989049

এখানে সব ধরনের
Mico-Bosch
TVS-Delphi Diesel Pump
ও
Turbo Charger
এবং
CRD Nozzle এর কাজ করা হয়।







Scanned by CamScanner

সম্পাদকের কলমে -

আমরা মানুষ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, এই কথা ভেবে আমরা সর্বদাই গর্বিত বোধ করি। কিন্তু সত্যিই কি আমরা মানুষ বলিয়া নিজেকে গর্বিত বোধ করার মত কাজ করে থাকি।

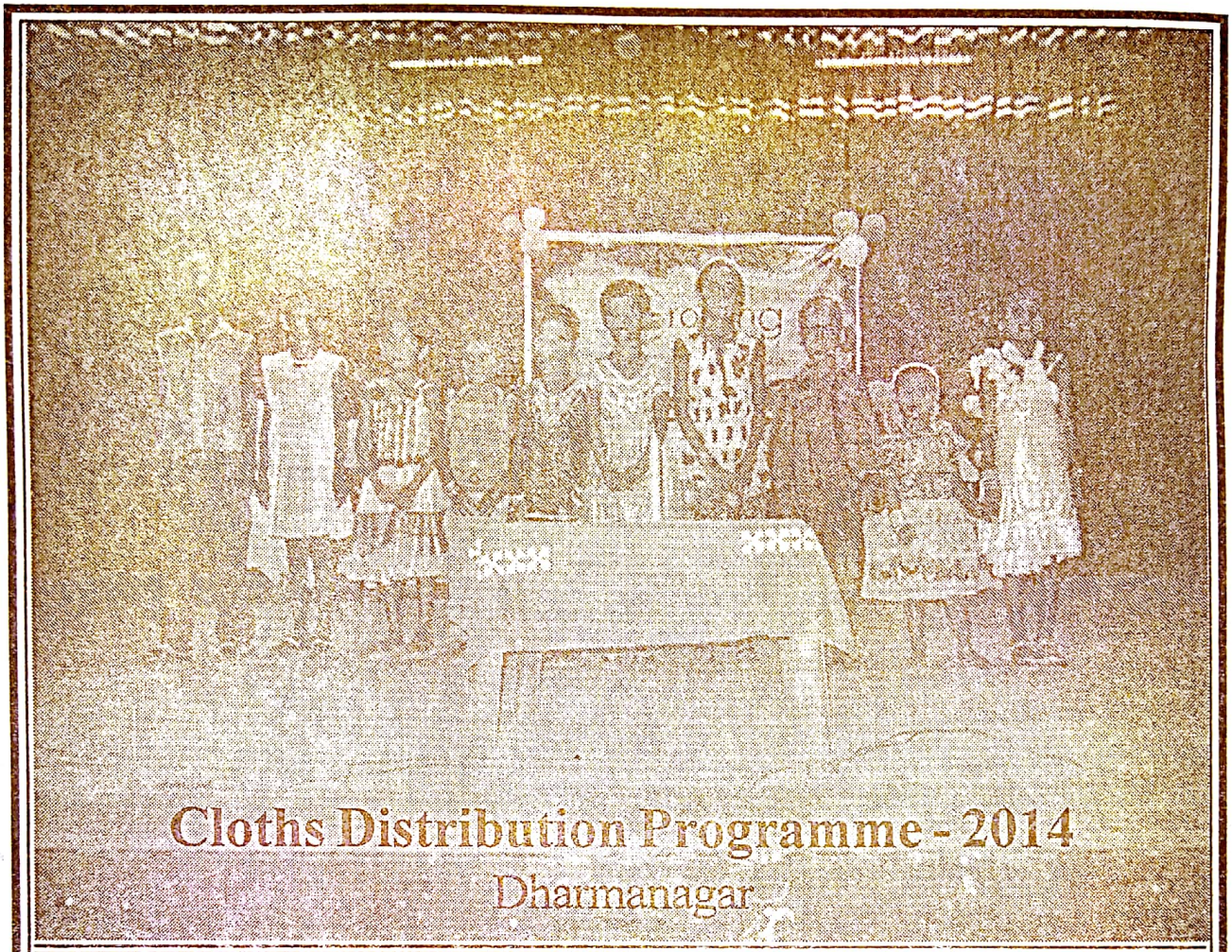
অতি সম্প্রতি আমরা সকলেই 'স্মার্ট' নামে একটি ভিনদেশী শব্দের আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে বেশি আনন্দ বোধ করে থাকি। আমাদের হাতে এসে গেছে স্মার্ট ফোন, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, এরাই আমাদের নিত্যসঙ্গি। হ্যাঁ সঙ্গি তো বটেই কারন এটির মাধ্যমেই তো সুস্মিতা, প্রিয়াঙ্কা, অনুস্কা ওদের ছবি আমাদের গ্যালারিতে আসে। আরো ঐ যে দীঘির পাড়ের আড্ডা। ঐ আড্ডার রসদ ওতো স্মার্ট ফোন দ্বারাই আসে। আর এখানেই তো আমরা নিত্যদিনের কালেকসন শেয়ার করে থাকি।

বিশ্বের যেকোনো খবর আমাদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে। আমরা তখন উন্মাদ হয়ে যাই। ঐ যে দিল্লির ধর্ষন কান্ড কিংবা মুম্বাই বা কোলকাতা। আমরা তো প্রতিবাদ জানাই, ক্যান্ডল লাইট নিয়ে রাস্তায় নামি কিছুক্ষন সান্ধ্যভ্রমন করি, স্থানীয় মিডিয়ার কাছে স্মার্ট ভাবে নিন্দা জানাই, আর তারপর। আবার দীঘির পাড়ের আড্ডায় যুক্ত হই। তখন আবার ঐ সুন্দর মেয়েটিকে দেখে কটুক্তি করতে আমরা লজ্জিত বোধ করিনা। কারন আমরা স্মার্ট।

আমরা উন্নত, সভ্য। কিন্তু আমাদের মানবিকতা আজও অনেক পেছনে রয়ে গেছে। তাই প্রয়োজন মানবিক মুল্যবোধ উন্নতি করানোর। আমি, 'আমার' এই ভাবনাকে পিছনে ফেলে 'আমাদের' ভাবনা ভাবতে পারলে হয়ত সমাজের উপকার হতে পারে।

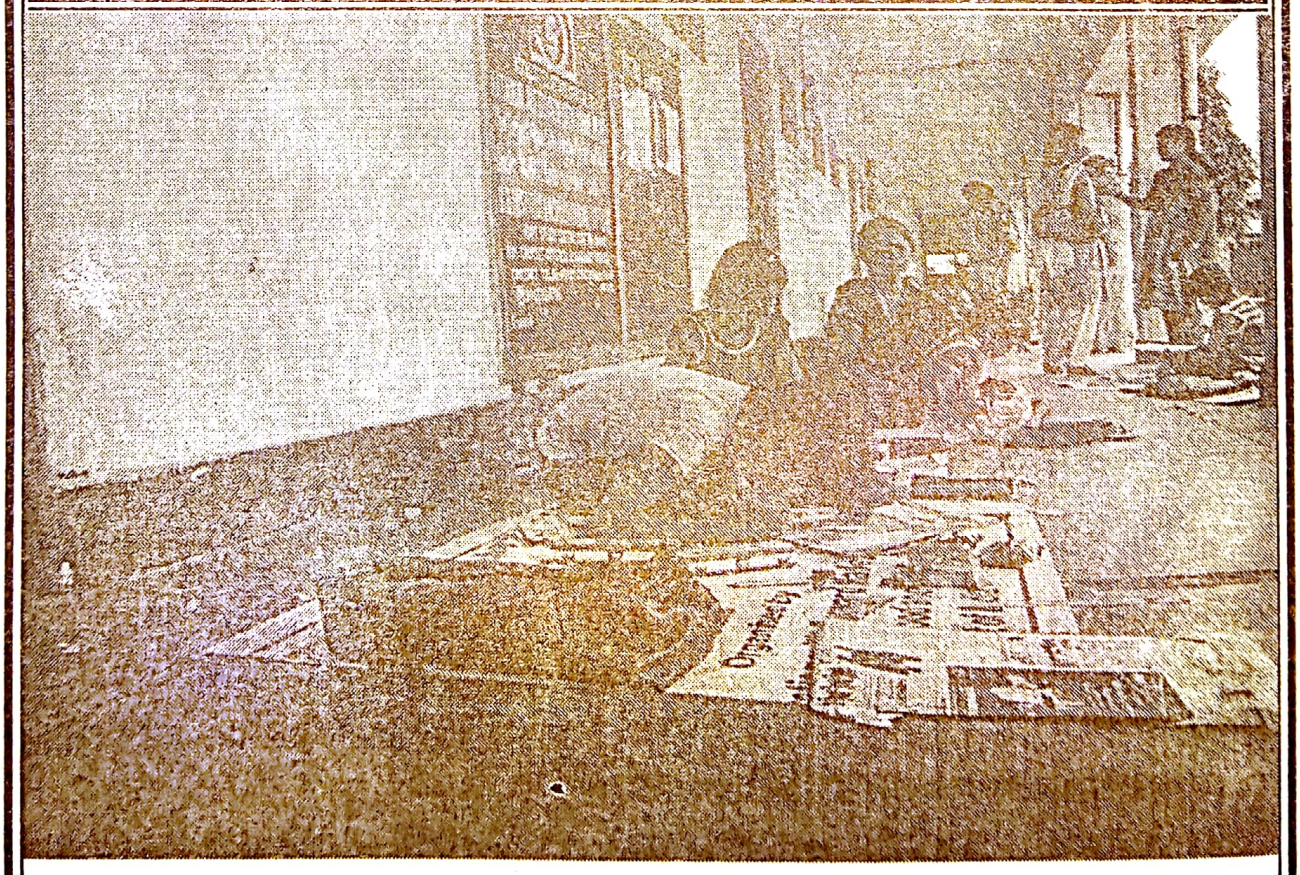
Growing Seed
October, 2015

Scanned by CamScanner



Cloths Distribution Programme - 2014

Dharmanagar



Art Competition

Organized by : Growing Seed

Scanned by CamScanner



অব্যক্ত

❖ বিধান চন্দ্র দে।

(১)

যজ্ঞডুমুর আর আকন্দ গাছের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড়ের শর্টকাট পায়ে চলা পথটাই অফিসটিলা। যাবার পথ হিসাবে বেছে নিল মানব। পথটার পাশ ঘেষে একটা মরাগাঙ্। এক সময় স্রোতস্বিনী বহমান নদীই ছিল। সামর্থ মতো দু'কূল প্লাবিত করতো বর্ষার মরশুমে। নামও ছিল একটা জুরি নদী। এখন নামধাম মুছে গিয়ে হয়েছে মরাছড়া। এই শহরের যত আবর্জ্জনা বুকে ধারণ করার পরিত্যক্ত স্থান। নোংরা শেওলা ধরা ক্ষীণ জলধারা।

সকাল থেকে কিম্ কর্ত্তব্য বিমূঢ় মানব হেঁটে চলেছে এপথ-ওপথ অলিগলি। দু'চারজন পরিচিত জন জিজ্ঞেস করেছেন 'মর্নিং ওয়াক করছেন বুঝি'। মাথা নাড়িয়ে মানব চলে গিয়েছেন। অনবরত ঢাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে একটা প্রশ্ন - 'এখন সে কী করবে ?' 'কোথায় যাবে ?' 'কে পথ দেখাবে ?' ইত্যাদি। অগত্যা অনেকটা সাহস সঞ্চয় করেই নির্দিষ্ট স্থান বেছেই মানবের এই পদযাত্রা।

(২)

'কাউকে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছেন যে, একটু আসুন, স্যার ডেকেছেন' - শহরের বিশিষ্ট নামজাদা অ্যাডভোকেট অরুণাংশু দত্ত চৌধুরীর এসিস্টেন্ট মানবকে চলে যেতে দেখে ডাকলেন।

মানব প্রায় সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখেও আবার ঘুরে দাঁড়াল। খানিকটা ইত:স্তত করে আবার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল। মানসিক ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার জন্যেও ধীরে ধীরে পা ফেরে উঠতে থাকল সে।

উপরের শেষ প্রান্ত থেকেই একটা করিডোর। না ঠিক তা নয়, যেন বুক চিতিয়ে পড়ে থাকা বারান্দা। বারান্দাও বলা যাবে না, যেন রাস্তা একটা।

খানিকটা জটিল পরিবেশে নিজের সরল সোজা খর্ব চেহারার ভাবমূর্ত্তি নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না অসহায় এই মানুষটি। সেই অসহায়তাকে যেন মনবেদনা জানানোর কারণেই চারপাশ সুনসান। আর নিস্তব্ধতার ব্যক্তিত্বের সামনে দু'চারটে ছোট খাটো শব্দ গুঞ্জন আদৌ পাত্তা পায় না, উরেট বরং চাটুকারের মতো নিস্তব্ধতার আভিজাত্যের গুণগান গায়। প্রমান এই পরিবেশ। কিছু চুড়ুই ও পায়রার অনবরত

Scanned by CamScanner

অথচ মৃদু কিচির মিচির বক্ বকম্ কিংবা অদূরে বারান্দার একদম শিয়রে দাঁড়িয়ে ক'জন লোকের আলাপ চারিতা সামান্য অনুরণিত হলেও, নিমেষে শোষিত হয়ে তুলে ধরছে বিপুল শূন্যতাকেই।

(৩)

'এতক্ষণ এভাবে বসে থেকে কেউ কী চলে যায় !' – গুরু গম্ভীর গলায় প্রথম সম্বোধনে অ্যাডভোকেট অরুণাংশু দত্ত চৌধুরী, এম, এ, এল, এল, বি কথা ক'টি বললেন। ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্টের উকিল। রাশ ভারী চেহারার লোক।

– নাই, ঠিক আপনি ব্যস্ত কিনা ! - মানবের গলায় যেন চিঁ, চিঁ শব্দ।

মৃদু হাসির রেশ টেনে উকিল বাবু বললেন, - বুঝলেন কিনা ব্যস্ততাই হলো আমাদের জীবন। যা বলার - নিন, তাড়াতাড়ি বলুন। নেহাত আপনাকে চিনি-জানি বলেই সময় দিতে পারছি। আজ আবার দু'দুটো কেস ফেস করতে হবে।

'স্যার, আমি কোর্ট-কাছারী, মামরা-মোকদ্দমা, আইন বিষয়ক কোন ব্যাপারই জানি না। বা' .....

মানবকে থামিয়ে দিয়ে উকিল বাবু বললেন - 'কী বলছেন মশাই, আপনি সব জানেন।'

'না - স্য-র, মানে।' - মানব আমতা আমতা করতে থাকে!

- 'কি - না - স্যর ! আমি বলছি আপনি সবই জানেন এবং বুঝেন', অনেকটা ধমক ও রাগত সুরে উকিল বাবু উচ্চারণ করলেন।

নিরুপায় মানব মাথা নত করলো।

হা - হা করে হেসে উঠে উকিল বাবু বললেন - আহা বুঝলেন কি না - এই সংসারে একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর সবাই আইন বুঝেনও জানেন। এই দেখুন না এখানে এলে যে আইনী সুরক্ষা পাওয়া যায় তা আপনি বিলক্ষণ জানেন এবং বুঝেন, ঠিক কি না ?

মানব অতিকষ্টে হাসি আনলেন মুখে। সত্যি এখন সমস্যা তাড়িত সময়ে লোকটা করছেন রসিকতা।

দু'জন এসিস্টেন্ট এসে এই ফাকে ফাইল সাজিয়ে কালো এ্যাটাচি গুছিয়ে দিয়ে পাশের ল্যাপটপ থেকে তথ্যাদি নিয়ে কয়েকটা প্রিন্ট আউন নিল। তাদের কিছু সময় ডিকটেট দিলেন অরুনাংশু দত্ত চৌধুরী।

ক্রিং - ক্রিং শব্দে এই সময়ে ফোনটা বেজে উঠল। উকিল বাবু রিসিভার উঠালেন। ফোনের ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনেই উকিল বাবুর সম্ভ্রমে 'স্যর' সম্বোধন এবং সিরিয়াস কথা-বার্তা থেকেই বুঝা গেল খুব একটা জটিল বিষয় নিয়েই তাঁদের আলোচনা চলছে।

ফোনের অপর প্রান্তের দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তি সম্পর্কে মানবের কোন আগ্রহ না থাকলেও অরুনাংশু বাবুর চেম্বারটা বেশ রুচি সম্মত এলিট গোছের এ ধারণা তাঁর হলো।

সারি সারি তাকে তাকে লাল-নীল-হলদে হরেক রকম ফাইল সাজানো। এগুলিতে হয়তো মানবের মতোই কত হতভাগার চাপা দুঃখ, কান্না, ক্ষোভ, আর্তনাদ, পাওনা-বঞ্চনা, প্রতিবাদ

Scanned by CamScanner

মোটা মোটা সব আইনের বই - ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ক্রিমিনাল লজ্, সিভিল লজ্, জুডিশিয়াল জুরিকডিকশন, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট আরো কত কী ! ওয়াল ক্যালেন্ডারে গান্ধীজীর হাসি মাখা মুখ আর বড় বাঁধাই করা ফ্রেমে ভারতের সংসদের ফটোর নিচে লেখা রয়েছে - 'সত্যমেব জয়তে'। এসব দেখতে দেখতে মানব তন্ময় হয়ে গিয়ে ছিলেন, হঠাৎ ডাকে সম্বিত ফিরে এলো।

– কৈ মানব বাবু কিছুই বললেন না যে, ? - গম্ভীর অরুনাংশুর গলা।

– না, ঐ আপনি একটু ফোনে ছিলেন কিনা - হে - হে -

আচ্ছা। সরি মানব বাবু আমাকে এক্ষনি উঠতে হবে। আপনি বরং কাল বা পড়শু একটা ফোন করে আসবেন।

'ঠিক আছে।' ক্ষীণ কণ্ঠে মানবের গলা থেকে আওয়াজ বেরুল। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মানব নেমে এলো। সূয্যিটা তখন প্রখর তেজ ছড়িয়ে আগুনের হল্কা ঢেলে দিচ্ছে এই পৃথ্বি ভূমিতে।

(৪)

টানা ছ'দিন ধরে কোর্ট-চত্ত্বর চষে বেড়াচ্ছে মানব। কত জনের সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু সবাই কেমন যেন এক ছাচে ঢালাই ! প্রায় সবাই – কত নম্বর কোর্ট, কী কেস, এর আগে হিয়ারিং হয়েছে কিনা, আজ ফাইন্যাল না কি – এ সব প্রশ্নে জের বার হতে হতে মানব ভাবল, এখানকার সবাই তো দারুণ সচেতন। কিন্তু এই সচেতনতার সামনে দাঁড়িয়ে মানব ভেবে পেল না তার এখন কী করা উচিত।

– এই কোর্টের সরকারী কর্মচারীকে কেস হিষ্ট্রি বলে কী হবে ? তার চেয়ে বরং বার লাইব্রেরীতে যাওয়াই শ্রেয় ভাবল মানব।

অ্যাডভোকেট বসন্ত বিশ্বাস কোথায় বসেন, অনুগ্রহ করে যদি একটু বলেন ? - লোকটি মাথা তুলে ঐ দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে দিক নির্দেশ করলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে মানব বেরিয়ে এলেন।

(৫)

কলেজের একসাথে রুমমেট বসন্ত আর মানব। সুক্ষ্ম চালাকি আর ক্ষিপ্রতা বসন্তের স্বভাবজাত। তার তুলনায় মানব অনেকটাই ভোঁতা সেকেলে। কলেজের সবাই তাই বলতো। সে কথা আবার পরীক্ষা করার সময় এসেছে আজ।

তন্ন তন্ন করে অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পরেও মানব বসন্তের সাক্ষাৎ পেল না। এদিকে ক্লান্তি, স্নায়ুর চাপ আর প্রতীক্ষা করতে করতে মানবের গলা শুকিয়ে এল। একটু চা খেলে ক্লান্তি খানিকটা লাঘব হবে এই ভেবে দূরে বটগাছের নিচে একটা স্টল দেখতে পেল মানব। অদ্ভূত ভাবে এই গাছটা যতদূর তার শিকড় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে ঠিক ততটাই ডাল পালা পত্র-পল্লবে ঢেকে দিয়েছে। অর্থাৎ গাছটা অনেক বেশী সুরক্ষিত।

গাছের দিকে পা বাড়াতেই আচমকা পাশ থেকে কে যেন পরিচিত স্বরে ডেকে উঠল - মানব, কোথায় যাচ্ছিস, এদিকে আয় ! - এভাবে নাম ধরে কে তাকে ডাকতে পারে ! ঘাড় ফেরাতেই প্রায় ছুটে এসে সে হাত চেপে ধরল তাকেই এতক্ষণ মনে মনে খুঁজে ছিল মানব।

Scanned by CamScanner

কী রে কোর্টে ঘুরাঘুরি করছিস যে ? কোনো অপকর্ম ঘটিয়ে ফ্যাসেছিস কী ? - বসন্ত মৃদু হাসল।

আর বলিস না রে, আমি এতক্ষণ .....

কথা বলতে না দিয়ে অতি উৎসাহে বসন্ত প্রায় হিঙ্ হিঙ্ করে টেনে মানবকে নিয়ে এলো একটি ছোট্ট চেম্বারে। একটু বোস মানব, আমি এক্ষুনি একটা হিয়ারিং সেরে আসছি একদম নড়বি না - কিন্তু। প্লিজ, ওয়েট পর জাস্ট ফিউ মিনিটস বুঝলি। ..... গট্ গট্ করে বসন্ত দূরে চলে যাবার পথে মানব তাকিয়ে থেকে ভাবল কলেজের বন্ধুরা মিথ্যে এসেসমেন্ট করেনি। কোথায় মানব এসেছে তার বন্ধুর কাছে কীভাবে সে সামাজিক সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে তার আইনী পরামর্শ নিতে তা শোনার কারো অবকাশ নেই, উল্টে বন্ধুর অনেক সুখ-দুঃখ কথাই হয়তো মানবকে আজ শুনে যেতে হবে !

(৬)

মানব বসে রইল চেম্বারে, যেমনটা কয়েদী আসামীরা অপেক্ষা করে এজলাসে। মানব ওঠে দাঁড়ালো। পাশেই একটা কোর্ট রুম মনে হলো। খোলা জানলা পথে এক খন্ড সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে সাক্ষীর কাঠগড়ায়। কে জানে এই সৌর কিরণ সফলতা, এনে দেবে কিনা। সাক্ষীর হলফনামা লেখা পিসবোর্ডটা উল্টো হয়ে লটকে আছে। কে উল্টালো ওটা ? সত্যের দেবতা ? না কি ওটার আজকাল দরকারই পড়ে না !

সে যাই হোক তবু মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। চাইলেই কী রাতারাতি সমস্ত মূল্যবোধ ছেঁটে ফেলা যায় !

(৭)

এই ক'দিন কোর্ট চত্বরে আসার সুবাদে মানবের মনে হয়েছিল কারো কাছে সঠিক উত্তর এখানে আশা করা বৃথা। এ অন্য পৃথিবী। এখানকার সব লোকই অসহযোগ আন্দোলনের নেতা। কিন্তু কালক্রমে সে নিজেই বুঝেছিল খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজে দিতে সাহায্য না করাটা, কোনও অন্যায় নয়। সেটাই স্বাভাবিক। তাগিদ যার, দায়িত্বও তার। অতএব এর পর আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে সে নিজেই সব কিছু খুঁজেছিল। কোনও উকিল, মোক্তার বাদ যায়নি। আর তখনই মানব প্রথম অভিজ্ঞতাটার স্বাদ পায়।

চেম্বারে বসতে বসতে অসহায় মানব ধৈর্য্য হারিযে বেড়িয়ে এসে বসন্তকে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল এদিক-ওদিক হঠাৎ হেঁচকা টানে এক ভদ্রলোক মানবকে বাইরে এনে দিলেন এক দাবড়ানি। অবশ্য এই বকুনি মানবের হিতার্থেই। কারণ আর একটু হলেই মানবকে জেল খাটতে হতো। সে কিনা ফুল স্লিভ সার্টের হাতাগুটিয়ে বোতাম খোলা অবস্থায় মাননীয় জজের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর চেয়ে বড় আদালত অবমাননা আর কী হতে পারে ? জেল-জরিমানা।

(৮)

'Hate the sin, Not the sinner' কোর্ট ঘরের ওয়ালে লেখা পংক্তি মানবকে আকৃষ্ট করলো। সে ভাবতে লাগলো এই অপরাধ বা পাপ কাজ না থাকলে এই আইন

Scanned by CamScanner

শাসন বিচার এগুলো সব অবান্তর হয়ে যাবে। মানুষ কোন নিয়মে বাধা থাকবে না, থাকতেও চায় না ! এ কোন জগত হবে ? যেখানে বন্ধনহীন মানুষ সৎ আর সত্যের পথে ধাবিত হয়ে বিবেক চালিত পথে ঈশ্বরত্ব পাবে!।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটা বিশাল ঘরের চলমান ভিড়ের ফাঁক দিয়ে চমকে ওঠা বিদ্যুতের মতো হঠাৎ মানব দেখতে পেল বসন্তের মুখ। কিন্তু পরক্ষণেই উধাও। বহুক্ষণ চলেছিল এই দৃশ্য আর অদৃশ্যের খেলা। আর তার খেলোয়াড় ছিল একমাত্র মানবই। কারণ বসন্ত ব্যস্ত ছিল আলোচনায়। অগত্যা মানব টালমাটাল ঢেউয়ের ঠেলা সহ্য করেও চেষ্টা করেছিল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার। এ ছাড়া কীই বা করতে পারতো সে। এখানে কি চিৎকার করে ডাকা শোভা পায় ? মানব তো জানে না এখানে কত ডেসিবেল শব্দ আইন সম্মত। আর যদি ডাকতে হয় তবে মক্কেল হিসাবে উকিলের নাম ধরে ডাকাটা কি আইনানুগ।

(৯)

বড্ড লেট্ হয়ে গেল রে, সরি ! এদিকে আয় – মানবের হাত চেপে ধরে বসন্ত এগিয়ে চলল তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে। কালো কোটটা চেয়ারের গায়ে চড়িয়ে ইঙ্গিতে মানবকে শূন্য চেয়ারটাতে বসার অনুমতি দিল বসন্ত।

বল, – কেন এসেছিস ? দেখলি একদম ফুরসুত নেই ! তার উপর ছয়টা ক্রিমিনাল কেস নিয়ে ডিল করছি। ডোমিষ্টিক ভায়োলেন্স ! - এই তো চুড়াই বাড়ি বৌদ্ধ মঠের পাশে এক মহিলাকে বেদম প্রহার করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ওরই স্বামী। আমাকে সাক্ষী-সবুত ডেকে এনে কেস হিষ্ট্রি ফাইল রেডি করতে হচ্ছে ! যুবরাজনগরে এক জুয়েলারীর মালিককে চুরির কেইসে ফাঁসিয়ে দিয়েছে পুলিশ, তার বেইল নিতে পারছি না উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে। দর্জ্জির হাওরে গভর্নমেন্ট বাদী কেস স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে সিভিল মামলা লড়ছি। কদমতলার এক রেপ কেস, তারপর কালাগাঙ্গের পাড়।.....

মানব দাঁড়িয়ে পড়ল।

বসন্ত তখনও কী যেন বলে যাচ্ছে। শুধু বসন্ত নয়, মানবের মনে হলো সমগ্র সংসারের মানুষ তার স্বরে চিৎকার দিয়ে আকাশ-বাতাস মথিত করে দিচ্ছে শুধু নিজেদের কথাই বলে যাচ্ছে .....।

ধীর পায়ে কোর্ট চত্বর থেকে মানব বেরিয়ে এলো। মুক্ত আকাশের নীচে বুক ভরে নিল শ্বাস। টিলার ঢালু পথ বেয়ে সোজা নামতে মানবের মনে হলো এই অদ্ভূত সংসারে কেউ কারোও কথা শুনতে চায় না। কারো সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, নিজেরাই নিজেদের নিয়ে বিব্রত। অপরের সমস্যা তার সমস্যা থেকে বড় নয় এবং তার সমাধানের দায়ও তার নেই। মানব হাঁটতে লাগলো। অব্যক্ত যন্ত্রণায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো আর ক্রমশ তার হাতের আঙুল গুলি গুটিয়ে গিয়ে বজ্রমুষ্টিতে পরিণত হলো।

* * * *

Scanned by CamScanner

মনে পড়ে

❖ বিষ্ণুপদ দে।

সঞ্জীবকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল
তোর এত সুন্দর লেখা
বলেছিল একদিন
আর এত অযত্ন করিস তাতে ?
আরেকবার যখন আমাকে
দেখতে এল ফেল করার পর
বলল; 'পরিশ্রম' শুধু একটাই শব্দ
শব্দটা সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে গেছল
আরও কত কি
কত আড্ডা দিয়েছি সেদিন
পানিসাগরের এক বৃষ্টিবদ্ধ দোকানে
অথবা তার বাড়ীতে বসে
তর্কের ফোয়ারা উড়িয়েছি দুজনে
ছাবুয়াল থেকে নেমে আসার পর
তার নেতি-বিষ-মাখা প্রশ্নের ঝড়ে
মনে পড়ে আমার নির্বস্ত্র হবার ঘটনা
সত্যিই
জবাবগুলো জানা ছিল না
শুধু অবাক চোখে দেখতাম তাকে
যার প্রেরনায় আজকের আমি
সেই কিনা 'কীটস' - এর মত
নিরাশার ব্ল্যাকহোলে হয়েছে পরিনত
ডাক্তারেরা বলবেন হয়তঃ
রোগ বংশগত (Hereditary Disease)
কিন্তু আমি বলবো
সঞ্জীবের মৃত্যুর পেছনে
হয়ত আরও কিছু
হয়ত সমাজের বিশ্বাসঘাতকতাও
অনেকটাই দায়ী
আফশোষ হয় শেষবার যখন
দেখা হয় দুজ'নায়
বাইকে লিফট দেয়ার মত অবস্থা
ছিলনা টায়ারের
যদি দিতাম তবে টায়ার ফাটতো
কিন্তু ওর কথা মনে হলেই
বুকটা ফেটে চৌচির হত'না আজীবন
সে না দেওয়ার অক্ষমতা
কু'রে কু'রে খেতনা আমার মনটাকে
এখন যেভাবে
সঞ্জীবের ফাঁসীতে ঝোলা দেহটাকে
মনে করে আমি হতচকিত হই
যখন যখন স্মৃতিপাশে আমি আবদ্ধ হই,
আমার প্রিয় বন্ধু সঞ্জীবকে
মনে পড়ে, খুব মনে পড়ে।

(পুনঃসংকলিত - ১৪ই জুলাই ২০১৫)

* * * *

নেমেছে সন্ধ্যা

❖ রত্নজ্যোতি চক্রবর্তী

দেখেছি আজ বৃষ্টি
সারাদিন জুড়ে গেছে জানালায় ;
ভিজেছে সোনালী মঞ্চ
সাজানো সকাল –
কেঁদেছে বাইরের পথ।

হারানো গল্পের বই,
গোলাপের কাঁটা ;
রাতের গন্ধে ডেকেছে কাক –
ফোটেনি আলো,
তবু হয়েছে সন্ধ্যা !

* * * *

Scanned by CamScanner

হৃদয় কথা

❖ শিউলি শর্মা।

সৃষ্টি মগ্ন তুমি,
কলমও প্রস্তুত,
কাগজ নিচ্ছে না একফোঁটা কালি,
লেপ্টে আছে চারপাশ,
তবে; মাধ্যাকর্ষন শূন্য কোনো স্থানে চলে এসেছি,

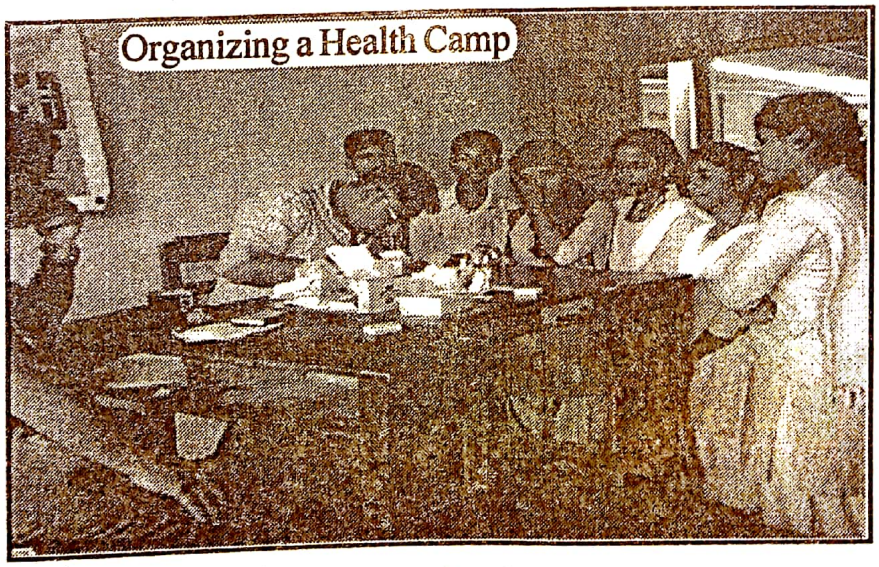
জীবন, মৃত্যু সমান সমান দূরত্ব,
এ কী স্থবিরতা ,
তোমার নীল নীল চোখ দেখে ,
আর ধক্‌ধক্‌ করেনা, জিয়া (হৃদয়)
বলছ ত হরমোন কমে গেলে এমন হয় ,
কথা বেড়ে যায়
পজেষ্টেরল কম হলে,

না না, রাত বাড়িও না,
শুতে চল,
ঘুম নিয়ে ভেবোনা,
আসার সময় হলে, অমনি আসবে।

কি ভাবো তুমি
না কিছু না -
বদলে যাচ্ছে সব,
এতদূর বদলাতে পারছিনা,
কেউ পারছে না,
ছুটছে আর দৌঁড়ে গিয়ে,
শেষ ট্রেন মিস করে বসে আছে,
বাড়ী যাবে, নাকি রাতটা প্ল্যাটফর্মে
কাটিয়ে দিয়ে,
ভোরের ট্রেন ধরবে,
চুপ কর'ত,
ঐ কান্না শোনা যায়,
না না কিছু না শুয়ে থাকো,
শুনছি তো,
ভাবো শুনছি না,
ভাবো কিছু না,
. . . . . .

সকালে যদি কোন দুঃসংবাদ পাই,
ভেবো না; পুলিশ, থানা,
তোমার কি;
ঘুমোবার চেষ্টা কর,
কিছু না, কিছু শুনছ না,
কিছু শুনছি না।

* * * *

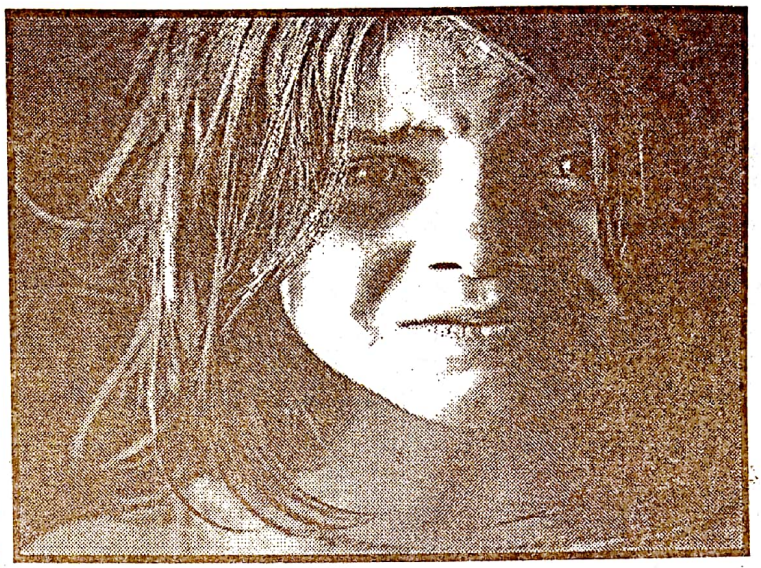


Scanned by CamScanner

এক টুকরো অনুভূতি.....

কিছু প্রশ্ন

❖ দেবাশিষ দাস।



সেদিন যখন চারমিনারের ধোঁওয়ায় বৃষ্টি ভেজা পড়ন্ত বিকেলে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে জীবনের আস্বাদ নিচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ অর্ধনগ্ন, বছর দশেকের একটি শিশু, ফ্যাকাসে মুখ, শরীরে কাদার ছোপ, আমার সাদা পাঞ্জাবিটা ধরে টানতে লাগল। পাঞ্জাবি থেকে ওর হাতটা সরিয়ে বিরক্তির সুরে ওকে বললাম, "এই যা এখান থেকে, হচ্ছেটা কি এই সব ?" শিশুটি আমায় বলল, "যাইমু গিয়া, পাঁচটা টাকা দেনা , ভাত খাইতাম" আর তাকিয়ে রইল আমার দিকে এক করুন দৃষ্টি নিয়ে। কথাগুলো আমাদের প্রায়ই শোনা, কিন্তু কেন জানিনা, সেদিন ওই কথাগুলো মনের দরজায় নাড়া দিয়ে গেল। শিশুটিকে বললাম, এই তোর নাম কি ? আর পাঁচ টাকায় পেট ভরে খাবার পাবি ? আমার নাম 'অপু', আর সে এও বলল, "জানি পাইতাম না, কিন্তু কিছু তো খাইতাম পারমু, আইজ সারাদিন কিছু খাইছি না, পেটেও বেতালা খিদা লাগছে"। ওকে বললাম, "কতো টাকা পেলে, তুই পেট ভরে খেতে পারবি"? "পইঞ্চাশ টেকা, চল্লিশ টেকার ভাত, সবজি, আর দশ টেকার ডাইল"। পাঞ্জাবির পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, "এই নে, আর যা, গিয়ে পেট ভরে খেয়ে আয়।" টাকাটা নিয়ে ও এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি পেট ভরি খাইলেউ কিতা অইল, বাড়িত মা বুবু, তারাও আইজ খাইছে না"। এরপর আমায় বলল "তুই ওউ টেকা দিয়া আমারে কিছু কিনি দেস্ না"।

বছর দশেকের সামান্য এক রাস্তার শিশু, সেই বিকেলবেলায় অনেক কিছু ভাবিয়ে গেল, অনেক কিছু শিখিয়ে গেল। দুপা হেঁটে, সামনের দিকে এগিয়ে, গোটা চারেক ডিম, কিলো দুই চাল, আর আধ কিলো আলু কিনে ওকে দিলাম। চলার পথে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে তোর বাবা কোথায়"? বলল, "জানিনা, মায়ে কইছইন বাবা গেছইনগি। মায়ে তো বেশি কিচ্ছু করতা পারইন না, তান হাত এগু ভাঙ্গা।" ওকে বললাম, "কিরে তুই পড়াশোনা করিস না?" যেতে যেতে ও বলে গেল, "পড়লে ভিক্ষা করতাম পারতাম নায়, আর ভিক্ষা না করলে বাড়ির হকলর পেটে দানাও পড়ত নায়", ...বলতে বলতে শিশুটি চলে গেল.....

শিক্ষা ! কি আশ্চর্যভাবে নব নব রূপে হাজির হয় আমাদের সামনে। একদিকে সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত লোক। যাদের বাড়িতে বইয়ের তাকে সাজানো হাজারো দামী দামী বই, এমনকি বইমেলায় গিয়েও ভালো বইয়ের অভাববোধ হয় তাদের কাছে, আরেকদিকে সমাজের বুদ্ধিজীবি মহল, যারা সমাজকে আলো দেখানোর জন্য সদাই তৎপর, অথচ নিজ সহধর্মিনীর অনুপ্রেরনায় ওই তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের অনেকেরই জনক জননীর স্থান হয় – বৃদ্ধাশ্রমে।

এক জন ভদ্র শিক্ষিত লোক থেকে ওই বছর দশেকের অর্ধনগ্ন শিশুটি যেন পুরোদস্তুর শিক্ষিত। সকলকে সাথে নিয়ে অন্তত এক বেলা হলেও সবার সাথে বসে খাবার ইচ্ছে তার।

স্মৃতিপটে, আপন শৈশবের প্রতিচ্ছবি ভেসে এল। যখন আমারও বয়স নয়-দশ, বাবা কোনোদিন

Scanned by CamScanner

স্কুটারে তো কোনোদিন গাড়ি করে স্কুলে দিয়ে আসতেন, টিফিনের সময় টিফিনের কৌটোয় কোনোদিন Egg Toast, তো কোনোদিন রুটি জ্যাম। বিকেলে বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্তে খেয়ে হয় টম এন্ড জেরি দেখতাম নয়ত Drawing Book নিয়ে Drawing করতাম।

খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে বাবা কতটুকু পরিশ্রম করলেন, মা খাবার খেয়েছেন কিনা, তা ভাববার অবকাশও নেই, হয়ত নেই বোধশক্তিও। শৈশব থেকেই জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে আমরা শিখে গেলাম নিজেকে কিভাবে আরও ভাল করে গড়া যায়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছুই একেবারে PERFECT হওয়া চাই। কিন্তু নিজের খেয়াল রাখতে গিয়ে যারা আমার খেয়াল রাখছে, যারা আমাকে 'আমি' বানিয়ে তুলেছে, তাদের দিকে থাকে শূন্য নজর। তাই যখন 'আমি' আমার 'PERFECT FAMILY' টার কথা ভাবি, তখন তাদের সরে যেতে হয়। চলে যেতে হয় নতুন এক জীবনে, সমাজ যাকে বলে 'বৃদ্ধাশ্রম'।

অনেক টাকা খরচ করে শুন্য জমিতে মাথা তোলে দাঁড়ায় সুদৃশ্য ভবন। নেতা মন্ত্রীরা এসে গলাভর্তি ভাষন দিয়ে উদ্বোধন করেন, ভাবটা যেন 'আহা কতনা পূন্যের কাজ করলাম!' বিভিন্ন সংস্থা এসে অনুষ্ঠান করে, কিন্তু নিজেদের পরিবার ছেড়ে, সন্তানের স্পর্শ ছেড়ে জীবনের সায়াহ্নে যারা এই নতুন পরিবেশে বুকে যন্ত্রনা নিয়েও, মুখে মিথ্যে হাসি দিয়ে নিজেদেরকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদের অন্তরের বিরহকে, তাদের নিঃসঙ্গতাকে একবারো কি আমরা অনুভব করার চেষ্টা করেছি ? আজকের আমার 'আমি' হওয়ার পিছনে অন্যতম কারন আমার জন্ম। যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েছি, তখন ভাগ্যদেবী লিখেছিলেন হয়ত হাসি, নয়ত ক্ষিদের আদিম কষ্ট।

যদি জন্ম হত ঐ বছর দশেকের শিশুটির মায়ের গর্ভে, কি হত তখন? তখন হয়ত পড়াশোনা, প্রতিযোগীতা, ভোগ আকাঙ্খা শব্দগুলি থাকত আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আজ হয়ত REYMOND বা PETER ENGLAND এর কাপড় পরে পুজোতে বেরুচ্ছি, তখন হয়ত অর্ধনগ্ন অবস্থায় লজ্জা নিবারনটাই আসল হয়ে দাঁড়াত। পূজো? সেতো অনেক দূরে! আজ হয়ত মায়ের সাথে মন্দিরে জন্মদিনের পূজো দিলাম, তখন হয়ত দুটো পয়সার জন্য ঐ মন্দিরের বাইরে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আজ হয়ত কিশোর কবির কবিতা পাঠ করে কোনো কবিতা পাঠের আসরে প্রথম হলাম, তখন পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি হয়ে কি ভাবে ক্ষুর্ধাতের সামনে এসে দাঁড়ায়, তা অনুভব করতাম।

তাহলে এই পৃথিবীতে আমার, তোমার, আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব কি শুধুমাত্র এ ছলনা, কল্পনা, নাকি অন্যকিছু ? শুন্য দৃষ্টি নিয়ে মেঘলা আকাশে চেয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম আকাশের পানে।

পড়ন্ত বিকেলে সিগারেটের ধোঁওয়ায় জীবনের আস্বাদ নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, আর বাড়ি ফেরার সময় সাথে ফিরল কিছু অনুভূতি, জাগল কিছু প্রশ্ন .....

যে আমায় পৃথিবীর আলো দেখালো, ছোট দুটি হাত ধরে পথ চলা শেখালো, ঝড়ের রাতে বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখল, যে নিজে না খেয়ে, আমায় খাইয়ে শান্তি পেল, যার জন্য আমার অস্তিত্ব, সেই তাদেরই জীবনের শেষ ঠিকানা যদি হয় বৃদ্ধাশ্রম, তবে সমগ্র মানবজাতির মনুষ্যত্বের নিকট আজ সত্যিই কী বিরাট প্রশ্ন তার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে .....

আর যে অর্ধনগ্ন, শরীরে গন্ধ লোকেদের দেখে নাক সিঁটকিয়ে আজ চলে যাচ্ছিলাম, একটু দাঁড়িয়ে যদি ভেবে দেখি, আমার ঐ দামী রংবেরঙের খোলস ছেড়ে আজ আমি যদি তাদেরই কেউ হতাম, তখন? .....

রইলাম উত্তরের অপেক্ষায় আমার মনের কাছে, আর চলতে থাকব পথ ততদিন.....

* * * *

Scanned by CamScanner

ধর্মনগরের ইমদাদ মামা

❖ নরেন্দু ভট্টাচার্য।

ধর্মনগরের ইমদাদ মিয়াকে কে না চিনে? আমি চিনতাম না। সেবারই প্রথম পরিচয়। ইমদাদ মিয়ার যে এতো পরিচিতি তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত: ইমদাদ মিয়া আদর্শবাদী রাজনীতি করে। আসলেও আদর্শবাদী রাজনীতির অঙ্গণে তার যাতায়াত অবাধ কী-না, তাও সবাই জানে না। কিন্তু ইমদাদ মিয়ার ভাবে-সাবে ব্যাপারটা সবাই আন্দাজ করেছে। দ্বিতীয়ত ইমদাদ মিয়া কর্পোরেশন দপ্তরে কাজ করে। আজ এমন কোনো শহরবাসী পাওয়া যাবে না, যার কর্পোরেশন দপ্তরে কাজ নেই। ইমদাদ মিয়া সবাইকে সাহায্য করে।

যেমন মনে করা যাক কারো বাড়ির বহু আগে বানানো টয়লেটের সেফ্‌টি ট্যাঙ্ক উপচে পড়ছে। পাড়াময় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সে বাড়ির গৃহস্থের পক্ষে টিকা দায়। সাথে সাথে পাড়ার লোকদের ভুগান্তির শেষ নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই সেই গৃহস্থ কর্পোরেশনে পরিচিত একটি লিঙ্ক খুঁজেন এবং ত্রাতা হিসেবে ইমদাদ মিয়া ছুটে আসেন। এসব ব্যাপারে কর্পোরেশন অফিস স্বাভাবিক নিয়মেই সাহায্য করে। তবে আপনাকে দরখাস্ত করতে হবে। আর সে দরখাস্ত করা কী কম হ্যাপা? কেরাণী বাবু থেকে অফিসার সাহেবের মন:পুত হতে নাও পারে। কেন তার কারণে পরে আসা যাবে। নতুবা ধান ভান্‌তে শিবের গীত হয়ে যাবে।

যে কথা বলছিলাম। চাকরিসূত্রে বাইরে থাকি। সচরাচর যাওয়া হয় না। কারণ পদমর্যাদায় আমি বিদেশে বিঁভূয়ে অফিসার। আর অফিসার বাবুদের অনেক কাজ। কেরানী বাবু আর অফিসার বাবুর গল্প আপনাদের পড়ে শোনাব। আগে জনপ্রিয় ইমদাদ মিয়ার কথায় থাকারই চেষ্টা করা যাক।

কর্পোরেশনের আপনার দরখাস্ত ত্রুটিবিহীন বিবেচিত হলেও তার পরের ব্যাপারটা কম নয়। নির্দিষ্ট চালানে আপনাকে টাকা জমা দিতে হবে। তার কি কম হ্যাপা? কর্পোরেশন বা অফিসগুলি ভোল আজকাল যথেষ্ট পাল্টেছে। টেবিলে টেবিলে কম্পিউটার। কিন্তু টাকা জমা দেবার ফর্ম এখনও বছর পঞ্চাশেক আগের মতোই অক্ষত বয়ানের।

হাজার চেষ্টা করেও অফিস ফর্মের এ গল্প (গল্প নয় সত্য — আমার জীবনের প্রত্যক্ষ সত্য) না শুনিয়ে পারছি না। যদিও আপনাদের পুরানো গল্প লেখকের ধাঁচে বলেছি, আসলে আগরতলায় থাকি। আগরতলাকে বিদেশ বিভূয়ে বলা যায়? মোটেই উচিত নয়। আগরতলা একেবারে রাজ্যের মধ্যে। ঝরঝরে মমতা রেলে (টানেলের মাঝখানে কিংবা পাহাড়ের ভাঁজ পেরোতে গিয়ে প্রায়ই রাস্তায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় ওটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। ব্রডগেজ আসছে। চড়ে গেলে কুল্লে সাড়ে চার ঘণ্টা মাত্র।

যাক অনেক দিন হলো আগরতলায় আছি। নিজের বাড়ি। আর যেহেতু বাড়ি, কৃষিকাজ না করলেও আমি গেরস্ত। তাহলে বাড়ির ট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হয়। বাড়ি সংক্রান্ত কিছু একটা প্রয়োজনে বছর আটেক আগে র‍্যাভিনিউ দপ্তরে যেতে হলো। দপ্তরে কেরানীবাবু জানালেন ফর্ম ফুরিয়ে গেছে আপনাকে নর্থ গেটের ভূমি আধিকারিকের অফিস থেকে ফর্ম জোগাড় করতে হবে। কী আর করা? প্রয়োজন আমার। রিক্সায় ছুটলাম নর্থ গেট অফিস। রিক্সাওয়ালাকে বললাম একটু দাঁড়াও। ফর্মটা নেবো আর আসব। অফিসে ঢুকলাম। ফর্ম চাইলাম। ফর্ম ছিলো। আনন্দিতও হলাম। যাক বাবা! আমার কাজতো হবে। গোল বাধল তখনই। ফর্মের দাম পঁয়ত্রিশ পয়সা। বিশাল ফর্ম। অসংখ্য রোলটানা ঘর। অসংখ্য দুর্বোধ্য বাংলা শব্দ। যেমন সেহামুল নম্বর ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দে মাথা ঘুরাতে বাধ্য। সে সব বলছি না। ফর্ম বিক্রেতা কেরানীবাবুর বক্তব্য, 'পঁয়ত্রিশ পয়সা দিন।'

Scanned by CamScanner

'পঁয়ত্রিশ পয়সা কোথায় পাব! পাঁচ টাকা রাখুন।' আপনাদেরই জিজ্ঞেস, করি বলুনতো পাঁচ টাকার নিচে এক ঠোঙা চানাচুরও হয়? সুতরাং কথাটা কী খুব অনায্য।

'না পঁয়ত্রিশ পয়সাই দিতে হবে।' আমি হলফ করে বলতে পারি। যারা এ গল্প পড়ছেন। তারা কেউ সারা ঘর খুঁজেও পঁয়ত্রিশ পয়সা বের করতে পারবেন না। আমার অবস্থা বোঝুন। গিলতেও পারছি না উগলাতেও পারছি না। সুরাহা হয় না। তিনটে ফর্মের দাম একটাকা পাঁচ পয়সা। বের করুন দেখি কার কাছে পাঁচ পয়সা আছে? ঘন্টা দুয়েক কেটে গেলো। হেনস্থা কাকে বলে — হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অগত্যা একটা সহজ সমাধান করলাম মনে মনে। কুড়িটা ফর্ম নেবো। আর তার জন্যে সাত টাকা। দেখা যাক যদি, দু'টাকা রিক্সাওয়ালার কাছে থাকে। ভাগ্যিস রিক্সাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম। অনেক কষ্টে দু'টাকা পাওয়া গেলো। সাত টাকায় কুড়িটা ফর্ম নিলাম। একটা ফর্ম চাই। কুড়িটা নিলাম। কি করবো? কেরানীবাবুকে বললাম 'উনিশটা ফর্ম আপনার কাছে থাকুক। আমার মতো কেউ বিপদে পড়লে তাকে দিয়ে দেবেন।' কিন্তু তিনি এমন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভয় পেয়ে গেলাম। যদি আবার সাতটাকা ফিরিয়ে দিয়ে ফর্মগুলি কেড়ে নেন। কুড়িটা ফর্ম নিয়েই বেরিয়ে এলাম। এসব কারণেই ধর্মনগরের লোকেরাও সহজ রাস্তা খুঁজেন। ডাক পড়ে ইমদাদ মিয়ার। এক চেষ্টাতে মোবাইলের ও প্রান্তে ইমদাদ মিয়া। বুঝিয়ে ঘটনাটা বললাম, মাছপুকুর থেকে মাছ ধরাবার লোক চাই।

যেহেতু আগরতলা থাকি। কালেভদ্রে বাড়ি যাই। ইমদাদ মিয়ার সঙ্গে পরিচিতি না থাকাই স্বাভাবিক। সেবার সস্ত্রীক ধর্মনগর। বাড়ির পুকুর থেকে মাছ ধরার জন্য জেলের দরকার। যখনই বাড়ি যাই, এ উৎসবটা হয়ে থাকে। যারা মাছ ধরে তারা তিনভাগের একভাগ নিয়ে যায়। বাকি দু-ভাগের এতো মাছ খাবে কে? নিজেদের খাবার মতো মাছ রেখে দিয়ে বাকিটা একটু কম দরে বেচে দিলে জেলেরাই কিনে নেয়। তাতে প্রতিবারই হাজার দুয়েক টাকা ঘরে আসে। কম দিনের জন্য বাড়ি যাওয়া। নির্দিষ্ট জেলে এলো না। মাকে ইমদাদ মিয়ার দারস্থ হতে হলো। পরদিন জাল এলো। জেলে এলো। ভায়া ইমদাদ মিয়া। এদের তদারকির কাজটাও স্বেচ্ছায় ইমদাদ মিয়া নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে বয়সে ছোট ইমদাদ মিয়াকে — ইমদাদ মামা বলেই সম্বোধন করলাম।

পুকুরে অল্প-বিস্তর জার্মানী ফেনা (কচুরীপানা) হয়। সিলেটি মাত্রেই জার্মানী ফেনা চেনেন। অন্যদের কানে কানে বলে রাখি। সিলেটিরা অনেক খোঁজ খবর রাখে। আগের দিনে তো গুগুল ছিলো না। তাই সিলেটিরাই ভরসা ছিলো। কচুরীপানা আদি বাসস্থানকে মাথায় রেখেছে সিলেটিরা। সন্তানাদিরা যাতে জানতে পারে তাই কচুরীপানার নাম সিলেটিদের মুখে জার্মানী ফেনা (প কে ফ বলতে কুণ্ঠা নেই আমাদের)।

যা বলছিলাম, পুকুরে কচুরীপানা হবেই। আর তা পরিস্কার করেই মাছ ধরার আদি রীতি।

ইমদাদ মামার একটা কায়দা আছে। এসেই দুজন জেলের সঙ্গে একটা মেকি লড়াই করে ফেললো। এটা যে গট-আপ সেটা বুঝতে আমাকেও কয়েকবার জন্ম নিতে হবে।

গেরস্তরা এ মেকি যুদ্ধে ভয় পেতে বাধ্য। আমিও পেলাম। ফেনা পরিস্কার হলো। মাছ ধরা হলো। তারপর ভানুমতীর খেল্ শুরু হলো। (বলে রাখি ভানুমতী কিন্তু সিলেটি নন্। উজ্জয়নে লোক।) যেহেতু জেলেরা কষ্ট করে এতো দূর থেকে এসেছে। একজন জেলেকে দেখিয়ে বললেন।

'ভাগ্নে জামালের বাচ্চার জন্য একটা মাছ দিয়ে দাও?' (সিলেটি বাংলাকে একটু শুধরে, ঘটি বাংলায় লেখার চেষ্টা করছি। এ কারণেই যে এমনতো হতে পারে আমার পাঠকদের মধ্যে নন্ সিলেটিও আছেন)। মুখ লজ্জা বলে একটা কথা আছে। বাচ্চার জন্য একটা মাছ চাইছে। পুকুরের মাছ। রাজি হলাম। প্রথম পরীক্ষায় ইমদাদ মামা পাশ। এবার একজন একজন করে সবাই একটা করে মাছ চাইছে বাচ্চাদের জন্য। ক্ষণিকের মধ্যে বুঝতে পারলাম ভানুমতীর খেল শুরু। তখন আমি পাকচক্রে। যে যার মতো একটা করে মাছ হাতিয়ে নিল। বাড়িতে

Scanned by CamScanner

ভাড়াটেরাও রয়েছে। লোকনিন্দার ভয়ে শিক্ষক মশাই কুয়াতে লুটা ফেলে দিয়েছিলেন। আমি তো অফিসার। ঝগড়া করিনি।

সবশেষে ইমদাদ মামা হেসে হেসে আমাকে বললেন। 'ভাগ্নে সবাইকে একটা মাছ দিয়েছো। আমিবা বাদ যাই কেন?' হক কথা। নয়টা মাছ যখন গেছেই। আরো একটা না গেলো।

এবার ভাগাভাগিতে গেলেন না মামা। বললেন, "যা হয় জেলেদের টাকা দিয়ে দিও। মাছ তো দিয়েছো। বরং আমি তোমার মাছটা বাজারে বেছে দিই।"

বেচে দেই। বেট রাখতে পারি, ইমদাদ মামা মঞ্চে উঠলে শিশির ভাদুরীরাও নিজেদের অভিনয়ের গুণমানে লজ্জিত হবেন। আমি তো কেউকেটা। রাজি হলাম। ব্যাগে পুরে কেজি দশেক মাছ নিয়ে বাজারে গেলেন মামা। বলাবাহুল্য একটার বেশি মাছ রেখে আমি কি করবো? রাখিনি।

ঘণ্টা দুয়েক পরে মামা এলেন। হাতে হাজার খানেক টাকা। আমার হাতে তুলে দিলেন। এই টাটকা মাছও নাকি ব্যাপারীরা কিনতে চায় না। টাকাটা নিলাম।

এবার মামা বললেন, 'ভাগ্নে জেলেরা ন'জন। আমি এক। দশ জনের দিনের মজুরীটা দিয়ে দাও।'

বুঝতেই পারছেন ততক্ষণে আমার ইগোতে লেগেছে। অথচ আমার সাথে স্পষ্ট কথা হয়েছে। আমি নিজেই স্বীকার করেছি মজুরী দেবো। তবে মামা যে বলেছিলেন কিছু একটা মজুরী দিয়ে দিও। কিছু একটা কথাটা পাঠকরা কাটুন তো। দেখুন বাক্যটা হবে মজুরী দিয়ে দিও। মামা তাই করলেন। রাগ, অপমান সবকিছু তখন মাথায় চেপেছে। গলাটা পাল্টালাম।

'কত দিতে হবে?' ইমদাদ মামার সেই বিনয় হাসি। উত্তরও সোজা সাপ্‌টা।

'তোমরা আমার লোক। অন্য জায়গা হলে বলতাম সাত হাজার। আচ্ছা পাঁচ হাজার দাও।' তার মানে মামা নিজের মজুরীসহ প্রত্যেকের জন্য পাঁচশো করে চাইছেন।

অনেক টাকা রোজগার করি। কিন্তু কেউ আমাকে ঠকিয়ে যাবে? ঘৃণায় ততক্ষণে বাকরুদ্ধ। গলা তুললাম। ফায়দা কোথায়?

একসময় রেগে ঘর থেকে এনে পাঁচ হাজার টাকা ছুড়ে দিলাম ইমদাদ মিয়ার দিকে (তারপরও কি ইমদাদ মামা বলা যায়? টাকাটা ছুড়ে না দিয়ে হাত দেওয়া যায়? — অবশ্য মামা শব্দটায় একটা ইতিহাস জড়িয়ে। শব্দটা সকলের পরিচিতি। শকুনি মামা)।

ইমদাদ মামাও কিছু মনে করলেন না। টাকাটা হাসতে হাসতেই কুড়িয়ে নিলেন। বলেও গেলেন 'ভাগ্নে আবার যখন বাড়ি আসবে। খবর দিও। এসে মাছ ধরে দিয়ে যাবো।' ইমদাদ মামা হাসতে হাসতেই বিদায় নিলেন।

আমি অঙ্কে কাঁচা হলেও। সোজা হিসাবটা বলতে পারি। নিজের পুকুরে কুড়ি কেজি মাছ বিসর্জন দিলাম। নিজের পুকুরের একটা মাছ কিনে খেলাম চারহাজার টাকায়। এমনই ইমদাদ মামার খেল্। ইমদাদ মামা ভানুমতীর যুগের হলে, লোকেরা ভানুমতীকে জানতোই না। ভানুমতীর খেল্-এর বদলে নিশ্চয়ই বলতো। ইমদাদ মিয়ার খেল্।

আজও ইমদাদ মামাকে স্বপ্ন দেখি। কাল রাতের স্বপ্নের গল্পটা এক ফাঁকে বলে নিই।

ইমদাদ মামা বাড়িতে এসেছে। একটা গাছে এক ছড়ি কলা পেঁকে আছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট বড়ো বড়ো কলা। বেশ বড় ছড়ি (কাঁদি) ইমদাদ মামা বললো 'ভাগ্নে, কলাগুলি বাদুরে খেয়ে নেবে। ছড়িটা কেটে দেই।' জানি না স্বপ্নেও আমি বোকা কেন? রাজি হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কত দিতে হবে?'

'না না তোমার কাছে কি চাইব। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিও।' আমি রাজি হলাম। দুপুর বেলা। ভাবলাম ততক্ষণে স্নান করে আসি। স্নান করে এসে দেখি, মামা কলাগাছটা গোড়াতে কেটেছে। কলাগাছের খোল ছাড়া আর

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

কিছুই পরে নেই।

'এতো বড়ো কলার কাঁদি কোথায় গেলো?' মামাকে জিজ্ঞেস করলাম।'

'আর বলো না ভাগ্নে। আমার একটু ইসে .... পেয়েছিলো। একটু জঙ্গলের দিকে গেছিলাম। এসে দিখে একটা ষাড় সব কলা খেয়ে ফেলেছে।'

'বুগুল গেলো কোথায়?' (সিলেটিরা কলা গাছে মাঝখানের অংশকে বুগুল বলে) কলাগাছ গোঁড়ায় কেটেছে কেনো? তোমার তো শুধু কলার ছড়ি কাটার কথা।'

'আর বলো না মামা। কলাগাছ বাড়িতে বড়ো জঙ্গল করে। তোমার জঙ্গল পরিস্কার করে দিয়ে গেলাম।' স্বপ্নেই বুঝতে পারছি ঠকে গেছি কিছু করার নেই। হাসতে হাসতে (সেই হাসিটা অক্ষুণ্ণ আছে) মামা বললো 'বুগুল কি আর তোমরা খাবে? তাই আমার লোকেদের দিয়ে দিলাম।'

'ঠিক আছে বুগুল যারা নিলো তারা ষাঁড় তাড়াতে পারলো না।'

'না না ওরা চলে যাবার পর ষাঁড় এসেছিলো।' — কি আর বলা? সম্মানে বাঁধলো। খুব রেগে গেছি। কিছু বলার নেই। চুপ করে রইলাম।

শেষ খেল দেখালো ইমদাদ মামা

'ভাগ্নে আমার টাকা দিয়ে দাও। কলাগাছ কাটার টাকা।' এতটাই রেগে গেছি পকেট থেকে একশো টাকা বের করলাম' ছোট নোট ছিলো না।

বললাম, 'পঞ্চাশ টাকা ফেরত দাও।'

মামা বললো, 'ভাগ্নে কতদিন পর ধর্মনগর এলে। চা খাওয়ার জন্যও পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারো।' টাকাটা ততক্ষণে দিয়ে দিয়েছি। কি আর করব? যাবার সময় মামা বলে গেলো 'ভাগ্নে আছোতো কদিন? আর কোনো কাজের দরকার হলে ফোন করবে। আমি তো আছি।' মামা চলে গেলো। তা-ও হাসতে হাসতে।

স্বপ্নে হিসাব করলাম। একটা কলাগাছ কেটে বাড়িতে জঙ্গল পরিস্কার হলো বটে। কি কি গেলো? কলাগাছ। হৃষ্টপুষ্ট কলার ছড়ি। যার বাজার দাম অন্তত: পাঁচশো টাকা ও পারিশ্রমিক একশো টাকা। ইমদাদ মামার খেল বটে। এক কলাগাছ কাটার দাম ছ-শো টাকা।

লাভ একটা হলো। অনেকদিনই ধরেই দীপালোককে ছিলাম একটা গল্প দেবো। প্লট পাচ্ছিলাম না। গল্পটা লেখা হলো বটে — ইমদাদ মামার দৌলতে। সত্যি বলছি 'ঠকে গেলে বড়ো অপমান লাগে। টাকাটা না হয় গেলো। স্বপ্ন থেকে মামাকে কেমন করে তাড়াই বলুনতো? ও আপনাদের কথা দিয়েছিলাম কেরানীবাবুর গল্প শোনাব, আজ আর হলো না। শেষে গল্পটা ছাপাই হবে না। পরের কোনো এক সংখ্যায় গল্পটা অবশ্যই পাবেন। আমি ধর্মনগরের লোক হলেও ইমদাদ মামা নই কিন্তু। অবশ্যই লিখব, কথা দিলাম।

পুন: ইংরেজরা অনেকদিন আগেই আমাদের কোহিনুর হিরে চুরি করে নিয়ে গেছে। কিছুতেই ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না। একটা কাজ করলে কেমন হয়? ধর্মনগরের সবাই মিলে চাঁদা তুলে লন্ডনে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? ভারত সরকার এতো বছরে যা পারেনি, আমার ধারণা এ ইমদাদ মামার বাঁ হাতের খেল্। প্রস্তাবটা ভাবা যেতে পারে।

এ গল্পের লেখা ইমদাদ মামা অবশ্যই কাল্পনিক। কারোর সাথে মিলে গেলে একেবারেই কাকতালীয় বলে ধরে নেবেন। হাসতে হাসতে। ইমদাদ মামার মতো করে)।

* * * *

মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

❖ স্বপন ধর।

'যা সরে যা, সরে গিয়ে পড়তে বস' - সত্যবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে দৌঁড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। বাচ্চা মেয়ে একটু-আধটু শাসন তো করতেই হয়, না করলে তো আবার বিগড়ে যাবে। আপন মেয়ে নয়, তবুও মেয়েটিকে নিজের মেয়ের থেকে কম আদর করেন না। টাকা-পয়সার দিক থেকে ততোটা ধনী না হলেও, নাম-ডাক, সুনামের দিক থেকে সত্যবাবু অনেক বেশী ধনী। পাড়ার কোনো বিপদ, অঘটন বা দুর্যোগ আসলে সব সময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সঙ্গে একটি সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত। স্ত্রী সাতবছর আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ছেলেও Engineering পড়া শেষ করে এখন বিদেশে চাকুরী করে। সম্পূর্ণ একার সংসারে এই ছোট্ট মেয়েটিকে নিজের মতো করে বড়ো করছেন। সব সময়ই নিজের কাছে কাছে রাখেন। মেয়েটির বয়স ১১-১৫ বছর, নাম মুন। ৫-৬ বছর বয়সে নিজের বাড়ি-ঘর, পরিবার সব হারিয়ে ফেলেছিল। এই সত্যবাবুই তখন থেকে মেয়েটিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করছেন। এমন স্বার্থপরতার যুগে এমন একজন মানুষ আশাই করা যায় না। বাবার থেকে ছোটো তাই সত্যবাবুকে সত্যকাকু বলেই ডাকি। মুনের সঙ্গে আমার আবার খুব মিল, আমাকে দাদাভাই বলে ডাকে। দেখা হলেই চকলেট কিনে দিতেই হবে, না দিলে নিস্তার নাই। অবশ্য আমারও কোনো ছোটো বোন নেই, তাই মুনকে ছোটো বোনের মতোই আদর করি। এই আবদার করাটা তো স্বাভাবিক। একদিন বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে হঠাৎ দেখলাম, সত্যকাকু মুনকে নিয়ে Dr. D. Debnath এর চেম্বারের দিকে গেলেন। আমিও একটু সামনে এগিয়ে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকু মুনের কি হয়েছে' বললেন 'না রে কাল রাত থেকে মুনের খুব জ্বর, শরীরটাও প্রচন্ড কাঁপছে, তাই ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলাম'। Dr. D. Debnath শহরে তো নতুন এসেছেন, কিন্তু উনি জ্বর, সর্দি এমন কোনো কিছুর ডাক্তার !!! ওইদিকে আবার বাড়িতে বাজার নিয়ে না গেলে রান্না হবে না, তাই 'আচ্ছা কাকু ঠিক আছে' - বলে আমি বাড়িতে এসে পড়লাম। বিকেলের দিকে মাঠে খেলতে যাওয়ার সময় সত্যকাকুর বাড়িতে ঢুকে দেখলাম মুন বিছানায় ঘুমিয়ে আছে আর কাকু মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ইশারায় বললেন, 'এখন আগের থেকে অনেক ভালো আছে'। আমিও একটু tension free হয়ে মাঠে চলে গেলাম। মাঠে অরুপ তো আমাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিল 'একটা ছক্কা মেরে দেখা' তাহলে আমার হাতের এই একশ টাকার নোটটি তোর'। ঠিক আছে আমার ভালো কর্ম নেই, তাই বলে কি চ্যালেঞ্জ

Scanned by CamScanner

হেরে যাব। কী বলবো, বেটে বলে এমন contact হলো যে, বলটি আর মাঠের বাইরে গিয়ে থাকতে পারলো না। অরুপ চুপ। দেরি না করে হাত পাতিয়ে একশ টাকা সোজা আমার পকেটে। আরে, দুদিন পরে তো পূজো, মুনের শরীর ঠিক না হলে বাচ্চা মেয়েটা এবার পূজোয় ঘুরতে পারবে না। এবার দেখি মুনকে একটা বন্দুক কিনে দেব। প্রত্যেকবারের মতো এবারও আমাদের পাড়ার সার্বজনীন দুর্গোপূজোর সভাপতি সত্যকাকু। উনি দায়িত্বে থাকলে পূজোতে কোনো বিঘ্ন ঘটবে তা হতেই পারে না। ষষ্ঠীর দিন সকালে পূজোর কিছু কাজ নিয়ে কথা বলার জন্য আমি সত্যকাকুর বাড়িতে গেলাম। মুন যেহেতু আছে, চকলেট তো নিতেই হবে। গিয়ে দেখি সত্যকাকুর সঙ্গে পাশের বাড়ির বিমলকাকুও বসে রয়েছেন। উনি আবার পূজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ। 'আরে বিমলকাকু যে ভালোই হল, পূজো নিয়ে কিছু কথা ছিল।' বলতে না বলতেই মুন সাদা রঙের একটি নতুন কাপড় পরে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 'আরে মুন তোমার এতো সুন্দর জামা কে কিনে দিয়েছে' - বলেই তার হাতে চকলেটটি দিলাম। কিন্তু সে যেন নিতে চাইছে না, ভয়মাখা চোখে বার বার ঘুরে ঘুরে সত্যকাকুর দিকে তাকাচ্ছে। 'আরে নিয়ে নাও, দাদাভাই আদর করে দিচ্ছে তো' - কাকুর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুন চকলেটটি নিয়ে দৌঁড়ে পাশের ঘরে চলে গেল। 'কী হল মা' - বলে সত্যকাকুও চেয়ার থেকে উঠে মুনের পিছন পিছন গেলেন। বিমলকাকু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'নিজের বাবাও বোধ হয় মেয়েকে এতো আদরে রাখে না'। তারপর সব কথাবার্তা সেরে সবাই মায়ের আরাধনায় লেগে পড়লাম। ভাগ্যিস, পেন্ডেল বানানোর দায়িত্ব পিন্টুদার উপর পড়েছিল। এবারতো আমাদের পেন্ডেল পাড়ার একনম্বর Position এ থাকতে বাধ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবারের পূজোয় মুনকে শুধু একদিনই সত্যকাকুর সঙ্গে পেন্ডেলে আসতে দেখলাম। যাই হোক, ধুমধাম করে মায়ের পূজো শেষ হল। পূজোয় এতো পরিশ্রম, বিছানায় শুয়ে শুয়েই একসপ্তাহ কেটে গেল। একদিন ভোরবেলা খুব ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল, স্বাভাবিক কথা বাইরে যেহেতু বৃষ্টি, টিনের চালে টুপটাপ শব্দ ঘুমতো এক্কেবারে জমজমাট। মা হঠাৎ বলে উঠলো মুনকে এমবুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি শুনে তো হতবম্ব হয়ে মুখ ধুয়ে ছাতি ছাড়াই রওয়ানা দিতে যাব, এমন সময় মা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে ছাতাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল। কিন্তু হাসপাতালে ঢোকার মুখেই দেখি পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানো, আমি দৌঁড়ে ভিতরে গিয়ে দেখি সত্যকাকুকে পুলিশ টানতে টানতে হাসপাতালের বাইরে নিয়ে আসছে, মুখটিও নীচু, আমি তো হতবাক, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি প্রসূতি বিভাগ থেকে মুনের মৃতদেহ বেরিয়ে এল, সঙ্গে Dr. D. Debnath.

* * * *

Scanned by CamScanner

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা

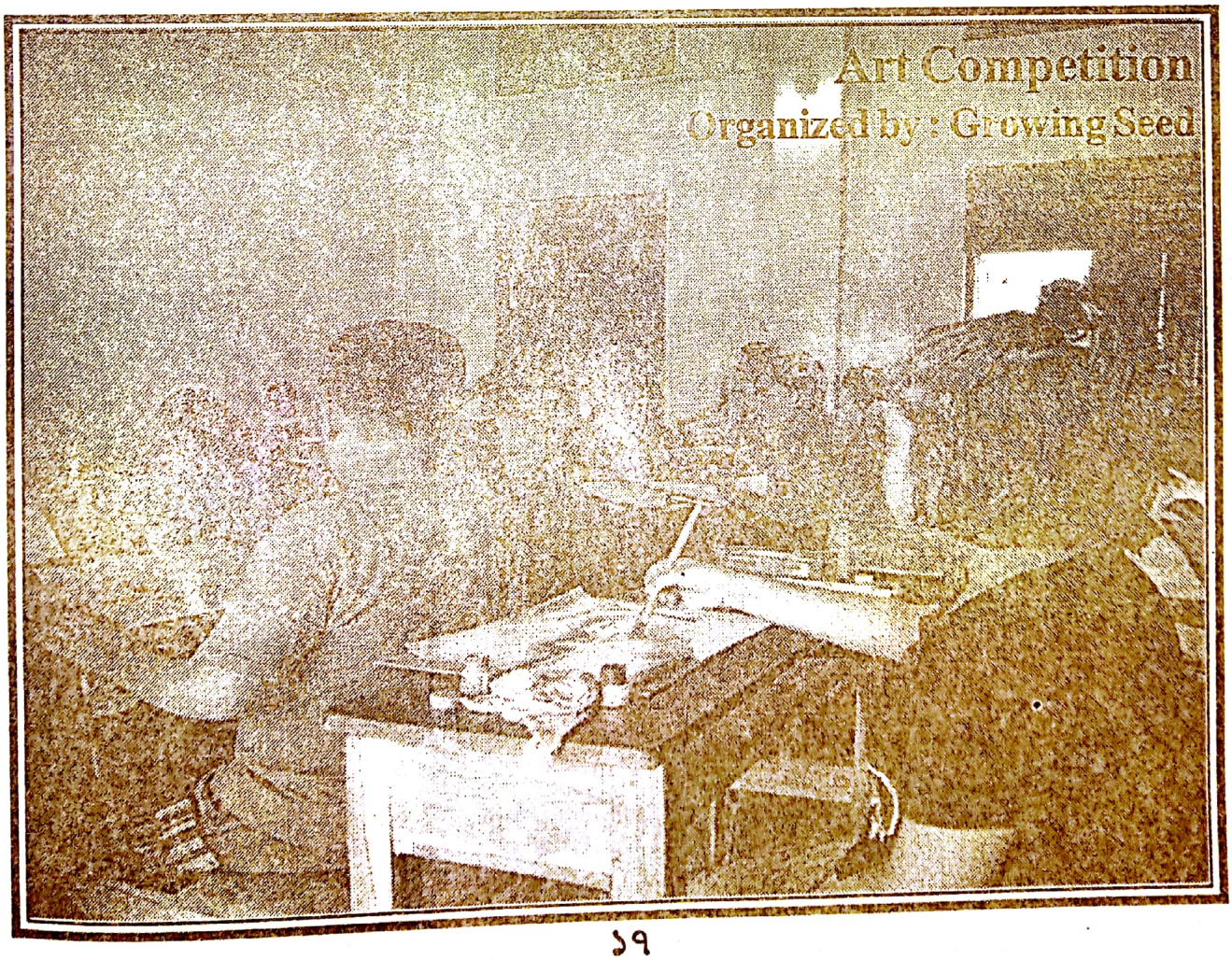
❖ কৃপাময় চক্রবর্তী।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানী লোকের সহিত চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, রত্নখচিত অমরবেদী বিশাল অট্টালিকার ভিতর বর্তমান ছাত্রসমাজের নির্মম পরিস্থিতির দিকে নিদ্রাহীন চোখে চাহিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। আমাদের এই ছাত্র সমাজের কিং কর্তব্য বিমূঢ় পরিস্থিতির পিছনে কারণ খুঁজতে গিয়ে যে সমস্যাটি আমার মানসে বিনিদ্র প্রহরীর মত উপস্থিত হয় তাহা হল আমাদের শ্রদ্ধেয় অভিভাবক ও ছাত্র মহলের নম্বরের পেছনে মরীচিকা দৌঁড়। ফলে সদ্য অংকুরিত শিশু মনে নম্বর নামক বৃক্ষটি রোপিত হয় আর শুরু হয় নম্বরের পিছনে ইঁদুর দৌঁড়। ফলস্বরূপ ছাত্র সমাজ আবদ্ধ হয় নম্বর বৃক্ষের কুহক জালে আর সংখ্যাগত জ্ঞান লাভের দিকে ধাবিত হয়। ফলে যোগ্যতামূলক শিক্ষার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে আর ছাত্র সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে সামগ্রিক জ্ঞান লাভ থেকে। দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টি আমার মনে রেখাপাত করে তা হল অভিভাবক মন্ডলীদের উচ্চাকাঙ্খা এবং সেই উচ্চাকাঙ্খাকে ছাত্র সমাজের উপর নির্দয় ভাবে চাপিয়ে দেওয়া। ছাত্র মহলের মনের সুপ্ত আশার বীজকে অংকুরিত হওয়ার পূর্বেই পদদলিত করে নিজের ইচ্ছার মহীরুহ চাপিয়ে দেওয়া হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। তৃতীয়ত, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দিনের পর দিন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়বহুল হয়ে চলছে, ফলে আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ মেধাসম্পন্ন অনেক পুষ্প পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই অকালে ঝরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেক অভিভাবক নিজের আর্থিক ক্ষমতা বলে ভুল পথে পরিচালিত হন আর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ভ্রান্ত প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পা দেন সঠিক সত্যতা যাচাই না করে। আর এই সনাতন মেষবৃত্তি পরবর্তীতে আর্থিক ও মানসিক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব হল বাইরের দিকের নালিশ। আর ভিতরের দিকের নালিশ গুলোর মধ্যে অন্যতম হল চাকুরী ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ নীতি। স্বজন পোষণ নীতি শিক্ষাঙ্গনের উপর যবে থেকে প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছে তবে থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে রাহুগ্রাস করতে শুরু করছে। গুণগত শিক্ষার মান ক্রমশ কমছে। স্বজন পোষণ নীতির ফলশ্রুতিতে যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠদানে এসে যোগদান করেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ স্নেহধন্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রায়শই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এদের মধ্যে কারও আবার গোড়ায় গলদ ও কারও বর্তমান প্রগতিশীল যুগের সাথে অসামঞ্জস্যতা যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবাঞ্ছনীয়। ফলে ছাত্র কিংবা অভিভাবক মন্ডলীদের মধ্যে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতি অনীহা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাইভেট টিউশন-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়ছেন তারা। ফলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা স্কুলের শিক্ষার বাইরে প্রাইভেট টিউশনের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আরেকটি

Scanned by CamScanner

প্রধান সমস্যা হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণনীতি যার ফলে অনেক সময় উপযুক্ত প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত কম উপযুক্ত প্রার্থীরাই মনোনীত হন, যা অন্তত পক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরুপ প্রভাব ফেলে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিযুক্ত প্রার্থী আর শিক্ষার গুণগত মানের বিকাশ আধুলির এপিঠ-ওপিঠ, যার ফলে উপযুক্ত প্রার্থীর নিয়োগ না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষার বিকাশ ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে পড়ে আর এর বিরুপ প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নয় সমগ্র জাতির উপর এসে বর্তায়। কারণ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ নালিশ হল শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে মতবিনিময়ের অভাব। শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে এক্ষেত্রে উদারতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহারা সর্বদাই নিজেদের বিজ্ঞ বলে করেন ফলে ছাত্র সমাজের মনের অনেক প্রশ্নই মনে থেকে যায় আজীবন। যদি শিক্ষক মন্ডলী উদারতার পরিচয় দেন কিংবা বন্ধুসুলভ আচরণ করেন এবং ছাত্রসমাজের সাথে মতবিনিময় করেন তা হলে প্রাইভেট টিউশনের আর প্রয়োজন হত না। অনেক ক্ষেত্রে আবার শিক্ষক মন্ডলীর ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক মন্ডলীর সাথে সখ্যতার দরুণ উপযুক্ত মেধাসম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীরা কিছুটা হলেও সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই আমাদের সবাইকে আজ এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার পরিকাঠামোকে পুনরায় নতুন সাঁচে সাজিয়ে তোলার জন্য। তবেই জাতির ও দেশের প্রতি আমাদের কিছুটা হলেও শ্রীবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে।

* * * *



Scanned by CamScanner

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

❖ রূপম দেবনাথ।

শব্দ ব্যবহার করেই নেভানো যাবে আগুন :-

মার্কিন যুক্তরাষ্টের ডিফেন্স অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রোজেক্ট এজেন্সি (ডারপা) এর বিজ্ঞানীরা এমন এক অভিনব প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন যাতে শব্দ ব্যবহার করে আগুন নেভানো সম্ভব। তারপর বিজ্ঞানীরা দ্রুত আগুন নেভানোর নতুন কোনও উপায়ের খোঁজে ২০০৮ সালে ইনস্ট্যান্ট ফায়ার সাপ্রেশন প্রোগ্রামের আওতায় গবেষনা শুরু করেছিলেন। তারই সূত্র ধরে শব্দ ব্যবহার করে আগুন নেভানোর নতুন প্রযুক্তিটি আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, স্পিকারের শব্দতরঙ্গ বাতাসের গতি বাড়িয়ে দেয়। ফলে হালকা হয়ে যায় আগুনের চার পাশের বাতাসের ঘনত্ব, এতে দহনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাবে নিভে যায় আগুন।

জীবানুতে ভরা থাকে স্মার্টফোন:-

যে স্মার্টফোন আপনার সর্বক্ষনের সঙ্গী প্রিয় বন্ধু সেটাই কিনা রোগের অন্যতম উৎস, জীবানুর আধার। শুধু তাই নয়, স্মার্টফোনের অপরিছন্নতা প্রভাব ফেলতে পারে আপনার শরীরে, সৃষ্টি হতে পারে নানা রোগ। যুক্তরাষ্টের ফোন কোম্পানি ফোনশপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেমস বার্নস (James Barnes) তার গবেষনায় দেখেছেন, নিত্যব্যবহৃত একটি মুঠোফোন গনশৌচাগার থেকেও ১৮ গুন বেশি নোংরা। বার্নস এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন - স্মার্টফোন সবসময় উষ্ণ ও অন্ধকার স্থানে থাকে। ফলে সহজেই জন্মায় ব্যাকটেরিয়া।

পারমানবিক বিস্ফোরনও মারতে পারেনি অদ্ভুত সেই বনসাইকে :-

একে একে পেরিয়ে গেছে ৩৯০টি বসন্ত, তার উপস্থিতিতে ঘটে গেছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। উত্তর-পূর্ব ওয়াশিংটনের জাতীয় উদ্যানের বামন বৃক্ষ যাকে পরমানু বোমার তেজস্ক্রিয়তাও কাবু করতে পারেনি। ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট সকাল ৮-১৫ মিনিটে হিরোসিমায় ৯৭০০ পাউন্ড ওজনের বোমা 'লিটল বয়' কে ফেলে আমেরিকা। প্রবল বিস্ফোরনে ও তার তীব্র বিকিরনে ধ্বংস হয়ে যায় কয়েক বর্গ কিলোমিটার এলাকা। তবে আশ্চর্য্যজনক বেঁচে যায় প্রাচীন হোয়াইট পাইন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে, বেশ কয়েক বছর আগেই নির্ধারিত আয়ু পেরিয়ে গেছে বনসাই পাইন গাছের। হিরোসিমা বিস্ফোরনের ৭০ তম বছরের স্মরনে বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে ঐতিহাসিক বনস্পতিকে।

সৌরশক্তি চালিত বিমান :-

বিশ্বের প্রথম দিবারাত্র চলনশীল সৌরশক্তি চালিত বিশালাকার বিমান Solar Impulse তার বিশ্ব পরিক্রমার অঙ্গ হিসাবে ভারতের আকাশে উড়ে গেল। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে এই বিশেষ বিমানটি ভারতের মাটিতে অবতরন করে। সুইজারল্যান্ড এর আবিস্কারক বিজ্ঞানী Bertrand Piccard ও André Borschberg কর্তৃক পরিচালিত সৌরশক্তি চালিত বিমানটি ভারত হয়ে এশিয়া মহাদেশ পরিক্রমন করে।

প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে ডিজেল জ্বালানী :-

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করে ডিজেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্য জ্বালানী উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য সামগ্রী যেমন গ্যাসলিন, মোম এবং লুব্রিকেন্ট তৈল উৎপাদনে

Scanned by CamScanner

সক্ষম তাঁরা। ভারতীয় বিজ্ঞানী যারা আমেরিকায় গবেষনার সাথে জড়িত, বিশেষত ডঃ ব্রজেন্দ্র কুমার শর্মা এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন। পাইরোলাইসিস নামক প্রক্রিয়ায় যেখানে প্লাস্টিক ব্যাগকে অক্সিজেন বিহীন কক্ষে উত্তপ্ত করা হয়। প্লাস্টিকজাত দ্রব্য থেকে প্রায় ৮০% জ্বালানী আহরন করা সম্ভব, যেখানে সাধারনত পেট্রোলিয়াম তৈল থেকে মাত্র ৫৫ -৬৫ % জ্বালানী আহরন সম্ভব হয়।

ক্যালসিয়াম ফসফেট জাত কাগজ :-

চীনা বিজ্ঞান সংস্থার বিজ্ঞানীরা এবং সাংহাই ইনস্টিটিউট অফ সেরামিকস্ একত্রে এক বিশেষ প্রকার কাগজ তৈরীতে সক্ষম হয়েছেন যা অগ্নিপ্রতিরোধক। পেপারটিতে ১০০০ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও আগুন স্পর্শ করতে পারে না। ক্যালসিয়াম ফসফেট জাত পেপার দেখতে সাধারন পেপারের মতোই। এটি জরুরী লেখা দীর্ঘদিন সংরক্ষনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রোটন দিয়ে ক্যানসারের নতুন প্রক্রিয়ার চিকিৎসায় সাফল্য :-

সাধারনত ক্যানসারকে দমন করার একমাত্র হাতিয়ার বলে পরিচিত কেমোথেরাপি এবং অপারেশন। তবে জার্মানির মিউনিখ ও হাইডেলবার্গের চিকিৎসকরা নতুন এক পদ্ধতির কথা বলেছেন, যাতে টিউমার সরাসরি দমন করা যায়। পরমানু কনিকা প্রোটন হলো তাঁদের এই মোক্ষম অস্ত্র। চিকিৎসা করা হয় ৯ মিটার ব্যাসের ও ১৫০ টন ওজনের ম্যাগনেট যুক্ত গোলাকৃতি একটি কক্ষে, যার নাম জেন্ট্রি। বিজ্ঞানীরা জানান, এই যন্ত্রটি থেকে প্রোটন রশ্মি রোগীর শরীরে প্রবেশ করে। যন্ত্রটি চারদিকে ঘুরতে পারে, তাই যে কোনো দিক থেকে রোগীর উপর রশ্মি ফেলা সম্ভব। এই রশ্মি দেখা ও শোনা যায় না, এর কোন গন্ধও নেই। প্রোটন রশ্মি রোগীর শরীরে সরাসরি টিউমারে প্রবেশ করে এগুলোকে ধ্বংস করতে পারে।

বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া টিকা :-

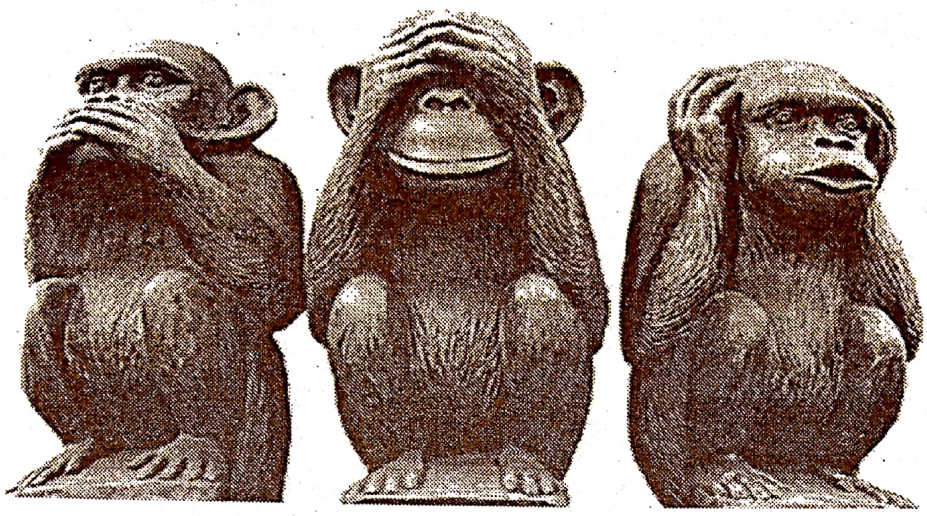
ইউরোপিয়ান মেডিসিন এজেন্সি, বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া টীকা RTS,S বা Mosquirix কে সম্মতি প্রদান করে। টীকাটি ৬ সপ্তাহ থেকে ১৭ মাসের শিশুদের জন্য বিশেষ করে প্রবল ম্যালেরিয়া প্রবন দেশ আফ্রিকার জন্য বাজারজাত করনের নির্দেশ দেয়। ব্রিটিশ ঔষধ উৎপাদক গ্ল্যাক্সো স্মিথক্লাইন টীকাটি প্যাথ ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউটের সাথে সহযোগিতায় উৎপাদনে সক্ষম হয়। এটি বিশ্বের প্রথম মানব টীকা যা পরজীবী রোগ নিরাময়ে প্রভূত সাহায্য করবে।

ডি এন এ গবেষনায় নোবেল :-

রসায়নে ২০১৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে নিলেন তিন জন। এরা হলেন Tomas Lindahl, Paul Modrich এবং Aziz Sancar। মানবশরীরের কোষের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে ডি এন এ -র বদল ও মেরামতি কি ভাবে হয়, এ জন্য ডি এন এ ম্যাপিং করে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ নথিভুক্ত করেছেন তাঁরা। বিজ্ঞানীদের মতে, ডি এন এ -নিয়ে এই গবেষণা আগামী দিনে জটিলতর রোগ নির্মূলে সহায়তা করবে।

* * * *

Scanned by CamScanner



আমার কি তাতে ?

❖ দধিচী।

কিছু দিন ধরে আমি 'দধিচী' ছদ্মনাম নিয়ে গল্প লিখছি। যথা সম্ভব বাস্তবিক প্রেক্ষাপটেই লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার পরেও মনে হঠাৎ হঠাৎ এক দুর্ভাবনার উদয় হয়। আমি 'দধিচী' এই শব্দটির অপমান করছি না তো? দধিচী সেই মহান ঋষির নাম যিনি অপরের জন্য অর্থাৎ দেবতাদের জন্য নিজের প্রানাহুতি দিয়েছিলেন। আর আমি ? আমি তো সাধারন মধ্যবিত্ত। না মধ্যবিত্ত হওয়া কিছু দোষের নয় তা আমি জানি। কিন্তু যা দোষের তা হচ্ছে আমি সেই নীরব শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের জীবনের একটি মাত্র মূলমন্ত্র, "তাতে আমার কি"? কিছু দিন ধরে আমার গায় জ্বালা করছে। কেন প্রতিবৎসর সামাজিক অধঃপতনের ছবি মনোরঞ্জক গল্পের মোড়কে পরিবেশন করতে হবে? সরাসরি বললেই বা সমস্যা কি? ভাবুন তো মোড়কে ঢাকা গল্পগুলি পড়ার পর আমরা কি করি? কিছুক্ষন ভাবি, তারপর খাবার খেয়ে শুতে চলে যাই!! তাই এবার আমার বাস্তব চিত্র দেখাই। এই দাবি শুধু আমার নয়, আপনার এবং সবার, যারা নীরব "আমার তাতে কি" শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত।

আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ হল মানিয়ে নেওয়ার গল্প। আমাদের গায়ে সহজে কিছু আঁচড় কাটতে পারেনা। যুগ যুগান্তর ধরে অর্জিত রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার আমাদের। আমরা মধ্যবিত্ত, সরকারী চাকুরীই সব। আমরা অনেকেই নিষ্ঠাবান। আপিসের বাবু ঘুষ নিচ্ছেন, আমার বিবেকে বাঁধে, তবুও আমরা প্রতিবাদ করিনা। কেন বলুন তো? কারন আমাদের কি যায় আসে তাতে, সদ্য চাকুরীপ্রাপ্ত তন্বী যুবতীর শরীরের উপর অফিসের বড়বাবুর লালসাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না, তবুও আমরা চুপ। কারন পুরো পরিবারের দায়িত্ব আপনার উপর। তার উপর ট্রান্সফারের জুজু ভয় তো তাড়া করে চলেছেই। তাইতো রাজনৈতিক দলের কাকাবাবু যদি বলেন 'ব্রিটিশ ভারতের মঙ্গলার্থে এসেছিল'; তাহলেও আপনার 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া উপায় নেই। যদি বলি ব্যাপারটা মারাত্মক রকমের বাজে হয়ে যাচ্ছে না তো? আশাকরি এক্ষেত্রেও উত্তরটা তৈরী, "আমার কি তাতে?"

আমি এক ইঞ্জিনীয়ার। অনেক পয়সা খরচ হয়েছে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। তাই পাড়ার অমুক ভাই

Scanned by CamScanner

এসে যখন বলেন কনস্ট্রাক্শনের খরচ কমাতে, তখন আমি মুখের উপর না বলতে পারিনা। কারন 'ভাই'(!) এর কোমরের পাশে ঝুলে থাকা চক্চকে বস্তুটাকে আমি ভয় পাই। আর তাছাড়া ও আমার কি ভাই? তাই না? কিন্তু যখন সেই কম খরচে বানানো পুল ফ্ল্যাট ভেঙে পড়ে মানুষের প্রান যায়, তখন কিন্তু নিজেকে দোষী মনে হয়, ভগবানের কাছে দয়া প্রার্থনা করে বলি 'ভগবান আমার কিছু করার ছিল না, আমি কিই বা করতে পারতাম'।

যখন দাঙ্গা হয় তখন কিন্তু আমি ভালোভাবেই জানি কে দায়ী; ধর্মোন্মাদদের রক্তচক্ষুর দিকে তাকাতে পারিনা আমি। যখন শানিত তরবারির ফলায় গর্ভবতী মহিলার উদর ছিন্নভিন্ন করে অথবা দুধের শিশুর গলায় কোপ বসায় তখন আমি নীরবে হাত জোড় করে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে বলি; ভগবান যদি আমার হাতে শক্তি থাকতো তাহলে এই নরপিশাচদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতাম। ভগবান মুগ্ধ হন, আর ভাবেন আমার সৃষ্টির সমালোচনা? কোন কোন সময়তো নিজের ধর্মাবলম্বীদের কাজে খুশীও হই। বিশেষত যখন নাস্তিকদের মাঝ বাজারে খুন করা হয়। ধর্ম আমার দুর্বল স্থান আর তার জন্য কেউ যদি আমাকে দুর্বল বলে তাহলে আমি সহ্য করবো কেন? আমার ঈশ্বরকে নিয়ে কিছু বলে কেন ওরা, ক্ষমতা থাকলে অমুকের ঈশ্বর নিয়েও বলুক। মাধ্যাকর্ষনের থেকেও বেশী শক্তিশালী ধর্মাকর্ষন। আর পূন্যের লোভ তো আমারও আছে।

রাস্তায় একা চলতে থাকা নারীর উপর যখন মানুষরূপী হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাংস খুবলে খায়, তখন আমারও রাগ হয়। ওদের গোপনাঙ্গ কেটে নেওয়ার অঙ্গীকার করি ফেসবুকে, কালো প্রোফাইল পিকচার লাগাই, মোমবাতি হাতে নিয়ে সেলফি তুলি। পরের দিন বন্ধু রাস্তা চলতি কোন মেয়েকে দেখে কটুক্তি করে তখন আমি কিছু বলি না, বন্ধু মানুষ বলে কথা। আর তাছাড়া আমার কি? এখন নিশ্চই প্রতিবাদ করবেন আমি শুধুমাত্র মধ্যবিত্তকেই টার্গেট করছি কেন? কারন সোজা, সমাজে তিন শ্রেনীর লোক থাকে, শাসক, শোষক আর নীরব। আর সবথেকে প্রয়োজনীয় শ্রেনী হচ্ছে নীরব।

এই শ্রেনী যখন নীরব থেকে যায়, তখন শাসকরা শোষন করতে থাকে আর শোষিতরা শোষনের শিকার হয়। উল্টো ঘটনাটাও কিন্তু ঘটে। যুগান্তর দল, অনুশীলন সমিতির নাম তো সকলের জানা আছে। মধ্যবিত্ত নীরব তখন সরব হয়েছিল। আমরা পারি কিন্তু করি না। কারন সেই 'তাতে আমার কি?' মনোভাব আমাদের অনেক কিছু। পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখলে দেওয়ালও ভেঙে পড়তে পারে। চলুন একবার চেষ্টা করে দেখি 'আমার কি' কে 'আমার সবে' পরিবর্তীত করতে। আমি আর পাপ করতে রাজী নই। আমার স্বর মিনমিনে নয়, সজোরে বলতে চাই 'আমি সাধারন লোক' বলছি। আমি বদলে যাচ্ছি, আর আপনি ??

* * * *

Scanned by CamScanner

খাওয়া-খাওয়ি

❖ নীহারেন্দু নাথ।

যা পাও সব খাও
খেতে নেই মানা
মানুষে বিশ কি না খায় -
নেই কারো জানা
খেতে খেতে পেট মোটা
ওপাড়ার সতুদা।
ঘোষ খেয়ে বড়লোক
এপাড়ার বড়দা
ভৃত্যটা গালি খায়
ছাত্রটা খাও বেত
বড়লোক হাওয়া খায়
সঙ্গেতে সাকরেদ
রুটি নেই ভিখারিটা
খালিপেটে খায় জল।
শ্রমিকেরা মদ খেলে
মনিবের মঙ্গল।
সুদখোর সুদ খায়,
দালাল খায় কমিশন,
গরিবেরা মাঘমাসে -
শীত খায় কন্ কন্।
ছোট মাছ ধরে খায় -
বড় বড় মাছেরা,
ইরাক-ইরান খায় বোস-ওবামারা।
সাপে যদি সাপ খায়-
করিনাতো মানা,
মানুষে মানুষ খায় -
আছে কি তা জানা ?

* * * *

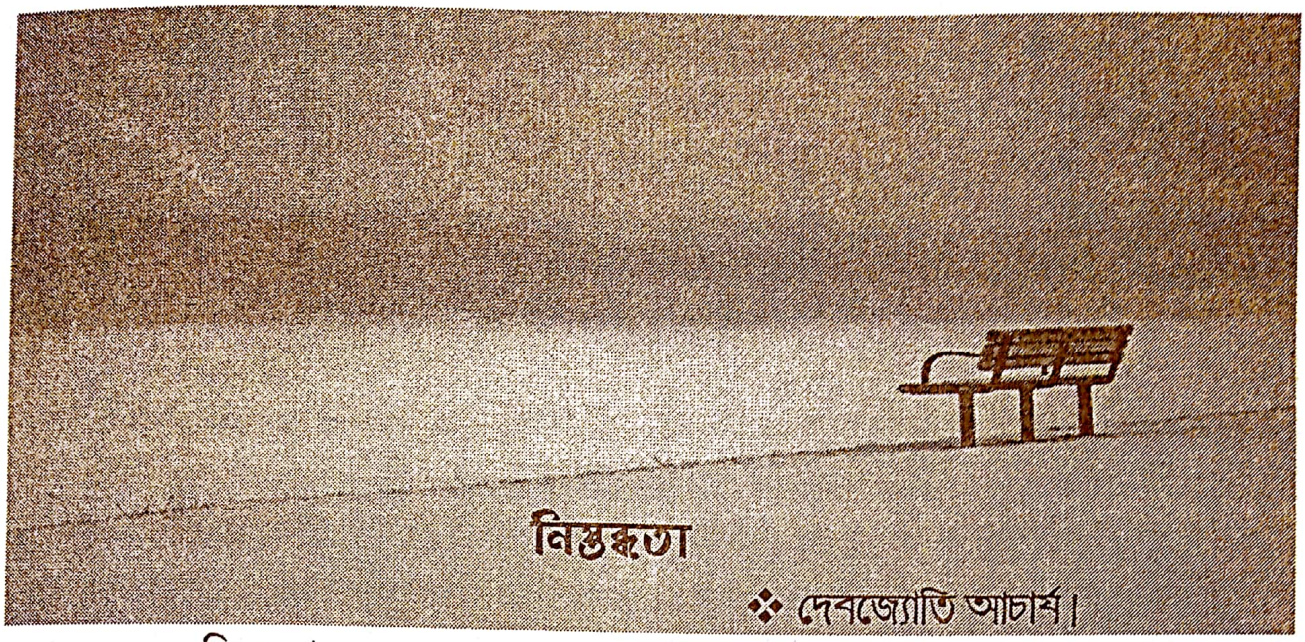
তুমি আসবে

❖ রজত নাথ।

তুমি আসবে,
সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে নীল আকাশে,
তুমি আসবে,
কুয়াশা-সিক্ত শিউলির গন্ধ ছড়িয়ে শীতল বাতাসে ।
তুমি আসবে,
গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে ,
রাঙিয়ে মাঠের সোনালী ফসল,
তুমি আসবে,
ছুঁয়ে যেতে দীনদুঃখীর কুঁড়েঘর ।
তুমি আসবে,
তাইতো আজ দুঃস্থ ছেলেটা পরেছে নতুন জামা,
তুমি আসবে,
তাইতো আলো জ্বলেছে কত অন্ধকারে
শত অভাব কে করে আজ মানা ।
তুমি আসবে,
তাই আজ মিলিয়েছে সবাই হাতে হাত,
তুমি এসে মিটিয়ে দেবে ,
সব হিংসা-বিদ্বেষ-বাদ-বিবাদ।
তুমি আসবে,
বুলিয়ে দেবে হাত, শান্ত হবে কত মাথা,
গরীবরা খাবে দুমুঠো, ঘুচবে তাদের সব ব্যাথা ।
তুমি আসবে,
তাই বলে দিন গুনে বসে আছি প্রতীক্ষায়,
তুমি চলে গেলে,
আবার আসবে জেনে থাকি অপেক্ষায় ।

* * * *

Scanned by CamScanner



নিস্তব্ধতা

❖ দেবজ্যোতি আচার্য।

নিস্তব্ধতা
কিছু অনুভূতি লিখছে আমার ডায়রীর পাতায়
বৃষ্টির স্পর্শ আর ভালবাসায় জোনাকিদের করেছে ঘরছাড়া
মাটির গন্ধ আর বাতাসের লজ্জায় করেছে আমায় উন্মাদ
হালকা আঁচে স্বপ্নলুচি ফুলছে নিজের মতো
বোবামুখে কিছু বলতে চাইছে হয়ত ইশারায় আমায়
তবে আমার কী সাধ্য তাকে বোঝার।
চাঁদের নিভে যাওয়া আলোয় সাক্ষী থাকছে এই আকাশ
হঠাৎ করে মেঘের গর্জনে শুনতে পেলাম স্কেসফোনের আওয়াজ
আর পেলাম একটি উপলব্ধি
উপলব্ধি আমার বেঁচে থাকার
উপলব্ধি এই প্রকৃতির সুন্দরতার
উপলব্ধি এই নিস্তব্ধতার
নিস্তব্ধতা ছন্দহীন একটি কবিতা লিখছে
নিস্তব্ধতা আমায় ঘুম পাতানোর গান শোনাচ্ছে
ও জানে আমায় চিনে আমায় হয়তো আমার থেকেও বেশি
আমার চোখে মাখছে ঘুম
আর ফেলছে অশ্বারোহীর পায়ের ছাপ
হয়তো এই রাত আর থাকবে না
হয়তো এই দেহ আর থাকবে না
হয়তো থাকবে না আমার শব্দ -আমার কবিতা
হয়তো থাকবে না ফুসফুসে লুকিয়ে যাওয়া
ভালোবাসা
শুধু থাকবে এই নিস্তব্ধতা
এই নিস্তব্ধতা।

Scanned by CamScanner

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস কি পাল্টে যাবে ?

❖ ড: রণেন্দ্র চন্দ্র নাথ।

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমরা সবাই জানি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে। আর প্রথম সৃষ্ট ঐ প্রাণের কোটি কোটি বছরের পরিবর্তনে এসেছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। স্বভাবতই মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে জানার আগ্রহ কার নেই। কিন্তু মুশকিলটা হল, বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, আর সেই পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত নয় মানুষের বিবর্তনও। আমরা এতদিন জানতাম আজ থেকে প্রায় ২৩০ কোটি বছর আগের আদিম বনমানুষ ড্রায়োপিথেকাস নানান থেকে একটি পথে র‍্যামাপিথেকাস নানান, অষ্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস, হোমো হ্যাবিলিস, হোমো ইরেকটাস, হোমো স্যাপিয়েন্স হয়ে বর্তমানের জীবিত মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স -এর আবির্ভাব ঘটেছে আজ থেকে মাত্র ৩০ হাজার বছর আগে।

কিন্তু সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সমাধি-গুহা থেকে আবিস্কৃত হোমো নালেডি নামক একটি প্রাচীন প্রজাতির দেহাবশেষ আমাদের এতদিনের জানা মানুষের বিবর্তন ধারাকে হয়ত পাল্টে দিতে যাচ্ছে। কারণ সদ্য আবিস্কৃত এই জীবাশ্মের সঙ্গে মানুষের আদি প্রজাতির মিল অনেকটাই। বিজ্ঞানীরা গত ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ইং বৃহস্পতিবার বলেছেন - এই জীবাশ্মের আবিস্কার মানুষের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের গবেষণায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করল। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের কাছাকাছি ঐ গুহা থেকে পাওয়া জীবাশ্ম বা হাড় গুলি সর্বমোট ১৫টি প্রাণীর এবং ঐ সমাধি গুহার গভীর থেকে গবেষকরা আরো প্রায় ১,৫০০টি জীবাশ্ম উদ্ধার করেছেন। গবেষকরা এগুলির বয়স সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হননি। তবে ঐ গবেষক দলটির প্রধান অর্থাৎ উইটওয়াটার্সর্যালান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্ন-নৃতত্ত্ববিদ লি. বার্গার বলেছেন যে, তাঁরা মানব সদৃশ একটি নতুন প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন, যারা বর্তমান মানুষের মত। তাদের মৃতদেহ গুলিকে সমাধি করত। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানী তথা আধুনিক মানুষদের ধারণা ছিল একমাত্র হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির প্রাণীই তাদের মৃতদেহকে সমাধি করত।

লন্ডনস্থিত ন্যাচারাল হিষ্ট্রি মিউজিয়ামের অধ্যাপক ক্রিস স্টিংগার-এর বক্তব্য হল একসঙ্গে ১৫টি প্রাণীর ফসিল আবিস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এই আবিস্কার মানুষের প্রচলিত বংশতালিকাতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে, যার জন্য এদের উৎস ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানার জন্য আরো গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। আবিস্কৃত এই প্রাণীর হাত ও পায়ের অস্থির সঙ্গে আধুনিক মানুষের অস্থির মিল বর্তমান, কিন্তু এদের মস্তিষ্কের আকৃতি ও শরীরের উপরের অনেকটা কমলালেবুর মতো, শরীরটা সরু, দেহের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ ফুট। ওজন প্রায় ৪৫ কেজি এবং এদের হাতের গঠন কোন কিছু ধরার বা হাতিয়ার ব্যবহার করার উপযোগী। এই আবিস্কারের ঘোষণা অনুষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্রিকার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট সিরিল রামফোসা বলেন আজকের দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা থাকবে, কারণ বিশ্ববাসী আজ নতুন ও উল্লেখযোগ্য কিছু জানতে পারল। আমরা অপেক্ষায় মানুষের জৈব বিবর্তনের ধারা কোন দিকে এগোচ্ছে, তা জানার জন্য।

* * * *

Scanned by CamScanner

রক্ত এবং রক্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য

❖ দীপালোক ভট্টাচার্য্য।

রক্ত দান জীবন দান। আমাদের সবার মধ্যে একটা ভয় ক্রিয়া করে রক্ত দান নিয়ে। রক্ত দানে সবারই একটা অনীহা দেখা যায়। যুব সমাজের একটা অংশ পিছিয়ে যাচ্ছে রক্ত দান থেকে। কিন্তু এই মহৎ দানের তাৎপর্য মানবকল্যানে অপরীসিম। রক্ত দান বিষয়ক কিছু দ্রষ্টব্য বিষয় -

ক। ১৮ থেকে ৬৫ বছর বয়স্ক যে কোনো সুস্থ ব্যাক্তি রক্ত দান করতে পারে।

খ। রক্ত দাতার ওজন ন্যুনতম ৪৫ কেজি হতে হবে।

গ। রক্ত দাতা প্রত্যেক তিন মাস অন্তর রক্ত দান করতে পারে।

ঘ। রক্ত দানে দাতার রক্ত বিভিন্ন মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়।
যেমন :- HIV, STDs (Gonorrhea, Syphilis) Malaria, Hepatitis ইত্যাদি।

ঙ। রক্ত দানে দাতা তার দেহের অতিরিক্ত রক্ত দান করার ফলে রক্ত দাতার দেহের কোনো আভ্যন্তরীন ক্ষতি হয় না।

চ। আমাদের দেহে লোহিত রক্ত কনিকার (R.B.C) স্থায়িত্ব কাল ৯০ দিন (3 Months), ফলে রক্ত দানের তিন মাসের মধ্যে রক্ত পুর্ন হয়ে যায় দাতার দেহে।

ছ। রক্ত দানের সময় রক্ত দাতার দেহ থেকে ৩৫০ মি: লি: রক্ত গ্রহন করা হয়।

জ। রক্ত রক্ততঞ্চন রোধক পদার্থ দিয়ে সংরক্ষিত করা হয় (Anticoagulant).
(Two types of anticoagulant are - Citrate Phosphate Dextrose Adenine & SGAM).

ঝ। রক্তকে মূলত : আটটি ভাগে ভাগ করা হয় - A +ve (A Positive), B +ve (B Positive) , AB +ve (AB Positive) , O +ve (O Positive), A -ve (A Negative) , B -ve (B Negative) , AB -ve (AB Negative) , O -ve (O Negative) ইত্যাদি।

ঞ। O Group (O +ve & -ve) কে সার্বজনীন দাতা (Universal Doner) এবং AB Group
(AB +ve & -ve) কে সার্বজনীন গ্রহীতা (Universal recipient) বলা হয়।

ট। উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে এখন রক্ত দাতা এবং গ্রহীতা কে একই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত রক্ত প্রদান করাহয়।

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য :-</u> গ্রহীতা যে রক্ত গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত সেই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত রক্তই প্রদান করা হয়। সার্বজনীন দাতা ও সার্বজনীন গ্রহীতা এই নীতি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখন প্রচলিত হয় না।

ঠ। রক্ত রোগীকে দেওয়ার পুর্বে Cross Matching করা হয়। দাতার রক্ত এবং গ্রহীতার সিরাম (রক্তের জলীয় অংশ সেন্ট্রিফিউজ করার পর) যদি Agglutination ঘটে তাহলে এই রক্ত প্রদান করা হয় না।

অ্যাগ্লুটিনেশন (Agglutination) মূলত অ্যান্টিজেন (Antigen) এবং অ্যান্টিবডির (Antibody) বিক্রিয়ায় (Reaction) সংঘটিত হয়।

Scanned by CamScanner

ড। রক্ত রোগীকে প্রদানের আগে রক্তের গ্রুপ দেখা হয়।

ঢ। রক্তকে ৪° সেলসিয়াস (4^0C) তাপমাত্রায় সংরক্ষন করা হয়।

ণ। রক্ত দাতা থেকে সংগ্রহ করার পর উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানে রক্ত থেকে Platelets , শ্বেত রক্ত কণিকা (W.B.C), লোহিত রক্ত কণিকা (R.B.C) আলাদা করা হয় এবং প্রয়োজণ অনুসারে রোগীকে দেওয়া হয়।

" রক্ত দানের চেয়ে মহৎ কাজ-
নাই যে ভুবনে।
রক্ত দানে তুমি - আমি বেঁচে আছি প্রানে ,
রক্ত দানে বাঁচবে এ ধরা ,
বড়ো প্রয়োজন রক্ত দানে অগ্রসর হওয়া।

* * * *

ধর্ম কি সত্যিই ধর্ম না অধর্ম

❖ অনুরাগ দেব।

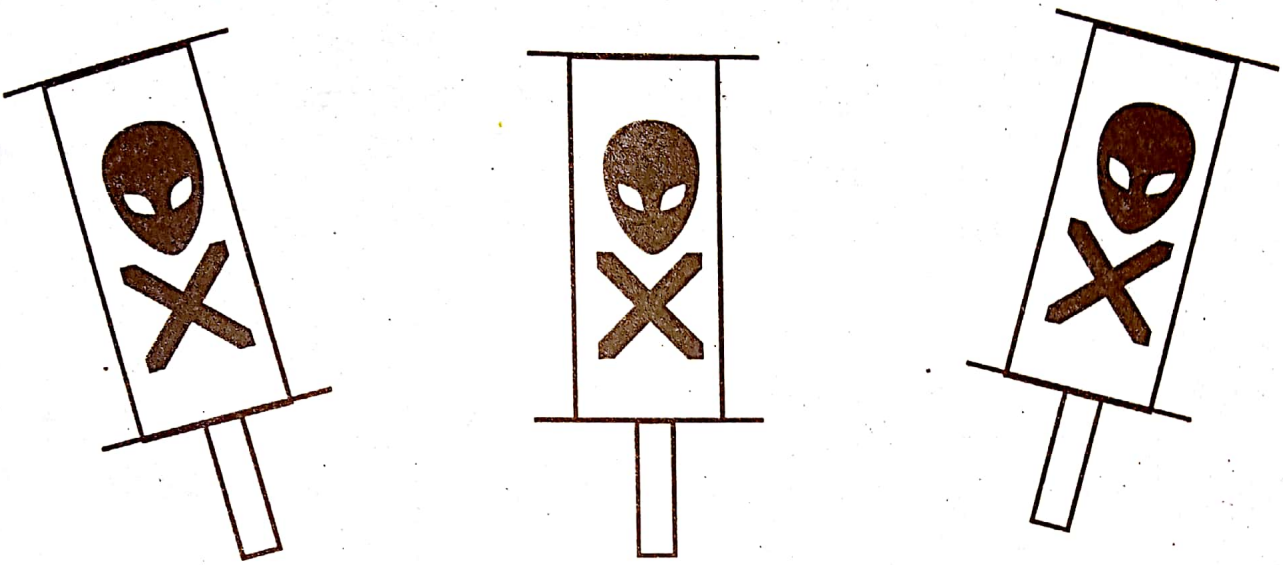
যে ধর্ম করে মানুষকে মনুষ্যতা হতে বঞ্চিত,
সে ধর্মের ধর্ম হয় ভিক্ষাবৃত্তি হতেও অধম।
যে ধর্মের শিক্ষা, 'নিজ ধর্ম ব্যাতীত সকল ধর্মই অধর্ম',
সে ধর্মের ধর্মে নাই কোন ধর্ম।
যে ধর্মের জন্ম হয় শরীরের জন্মে,
সে ধর্মের মৃত্যু তার জন্মে।
তাই আজকাল মনে জাগে একটি প্রশ্ন অহরহ,
আজ ধর্ম কি সত্যিই ধর্ম না অধর্ম।
যে ধর্ম শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য,
সে ধর্মে অর্থ বড়ই নিরর্থক,
যে ধর্ম নারীকে বন্দী করে রাখে অন্ধকারে,
সেই ধর্মের অন্ধকার দূর হয় না কোনও আলোতে
যে ধার্মিকের রাত্রি কাটে বিলাসীতার মাঝে,
সে ধার্মিকের মনকাননে ফোটে না কোনও শ্রদ্ধার পবিত্র ফুল,
তাই আজকাল মনে জাগে একটি প্রশ্ন অহরহ,
আজ ধর্ম কি সত্যিই ধর্ম না অধর্ম।

Scanned by CamScanner

ভাবান্তর

❖ রণজিৎ পুরকায়স্থ।

(নেশামুক্তি বিষয়ক পথনাটক)



(কালো কাপড়ে কঙ্কাল মুখ আঁকা ছবি নিয়ে পাঁচজন সমস্ত মঞ্চ জুড়ে হাঁটবে। অভিনেতাদের মুখ দেখা যাবে না। আতঙ্কের গুরুগম্ভীর আবহ, মাঝে মাঝে স্বজন হারানো কান্না। আর একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কপট হাসি। ১-২ মিনিট চলবে।)

সূত্রধার - "Hate the sin, not the sinner" পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়"। বহু প্রচলিত এই আপ্তবাক্যটি আবার নতুন করে ভাবনার সুযোগ এসেছে। নেশাকে ঘৃণা কর, নেশাগ্রস্তকে নয় ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাস্তায় কিংবা অফিসে, বাসে-ট্রেনে, স্কুলে-কলেজে যখন একদল মূল্যবোধহীন, বিকৃত রুচিসম্পন্ন পোষাক পরিধানকারী, উচ্ছৃঙ্খল যুবশক্তিকে দেখি তখন ঘৃণায় নাক কুঁচকে ভ্র ভঙ্গি করে গেল-গেল রব তুলে কেটে পড়ি। আমি তো এই নরক কূলের কেউ না। আমি তো অমৃতলোকের বাসিন্দা। কিন্তু আপনার এই উদাসীনতা, উন্নাসিকতা জন্ম দিচ্ছে আরও গভীর সমস্যার –

(সমস্ত মঞ্চ জুড়ে ৪-৫ জন নেশাগ্রস্ত ইতিমধ্যেই জড়ো হয়ে গেছে হঠাৎই একজনের সাথে ধাক্কা লেগে সম্বিত ফিরে সূত্রধরের। দুজন ভদ্রলোক-এর প্রবেশ সূত্রধরের প্রস্থান।)

Scanned by CamScanner

১ম জন - এ্যাঁ - এ দেখছইন নি, আমরার রমেশ বাবুর পোলা,

২য় জন - ছি-ছি-ছি কি বাপের কি পোলা, মুখ, মুখ ঘোরাইন, মান-সম্মান কিছু বাঁচত নায়। (কোন মতে কেটে পড়ে)

রমেশ বাবুর ছেলে - (হাতে ড্রেনডাইট, জোরে টান দিয়ে) শালা ভদ্রলোক -

নেশাগ্রস্ত -১ মান-সম্মান যাবে, না ! আমাদের সামনে দাঁড়ালে তোমাদের মুখোশটা যে খুলে যাবে বাবা।

নেশাগ্রস্ত -২ কে ঐ মালটা তো যার ফার্মাসীতে কচি ছেলেমেয়েদের ভীড় লেগে থাকে। নেশার টেবলেট বিক্রি করে। আর ঐ বাচ্চা মেয়েগুলোর কাছে Contraseptive pill কেন বাপু ! তখন নীতি-জ্ঞান - মান-সম্মান কোথায় থাকে ?

নেশাগ্রস্ত -১ সামনে কেমিষ্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট, আর ভেতরে নেশার ঔষধ। এইগুলি যখন বেঁচবে তখন আমাদের মতো frustated-তো যাবেই। না হলে তোমার গুদামের নেশার ঔষধ বেঁচবে কার কাছে, বল।

নেশাগ্রস্ত -২ "বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ আছে"। খুব বড় কেউ বলেছিলেন, কেন যে বলে শালা এমন কথা। অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। ক্লাস নাইন থেকে রুমির সাথে আমার বন্ধুত্ব। পরে বুঝলাম ওটা বন্ধুত্ব নয়, প্রেম।

নেশাগ্রস্ত -১ তুই তো আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হতিস, হ্যাঁ রুমির কি হল হঠাৎ ? মেয়েটা তো ভালই ছিল।

নেশাগ্রস্ত -২ ছিল, আছেও। খুব ভাল আছে এখন। শুনেছি ব্যাঙ্গালোরে Multi-national Company তে চাকরি করছে। আর সেই অফিসের বড়বাবু, ওর বস। ওকেই বিয়ে করেছে।

নেশাগ্রস্ত -১ আর তুই, চলে এলি আমাদের দলে, হা-হা-হা, আমার কিন্তু কোন কারণ নেই। জানিস আমি ড্রেনডাইটের প্রেমে পড়ে গেছি, হা-হা-হা। তোর মনে আছে টিফিনের সময় একটা লোক গেট আসত। পকেট থেকে দামী দামী সিগারেট, ডলার বের করে দেখাত। আর বড় ক্লাসের দাদারা লুকিয়ে কি যেন কিনত। একদিন আমিও গেলাম। নিজেকে বেশ বড় বড় মনে হল। কিছু পাউডার নাকে ঘসে দিল লোকটা। তারপর থেকে রোজ যেতাম, প্রথম দিকে টাকা নিত না। আর পরে ! টাকা না দিলে মারত। এখন সস্তা মজা। (ড্রেনডাইট দেখায়)

Scanned by CamScanner

নেশাগ্রস্ত -২ একেই বলে বোধ হয় সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত।

নেশাগ্রস্ত -৩ (অট্টহাসি) শালা সাম্রাজ্যবাদ ! ঘরে ঘরে সাম্রাজ্যবাদ বসে আছে। যে শালাটা নাক কুঁচকে চলে গেল। সে একটা সাম্রাজ্যবাদ, তোর রুমি একটা সাম্রাজ্যবাদ। আমার মা-বাবা দুটোই সাম্রাজ্যবাদ। নিজেরা ফূর্তি করে আমাকে ফেলে গেল রাস্তায়।

নেশাগ্রস্ত - আমার বাবা তার ব্যবসা, রাজনীতি-ফিতে কাটা নিয়ে ব্যস্ত, আর মা ফেসবুকে নিত্য নতুন সাজে ছবি আপলোড, স্ট্যাটাস আপলোড, মেসেজে চ্যাটিং-এ ভেলকিবাজির প্রেম চালিয়েই যাচ্ছেন। ছোটবেলা থেকে এই একা চলতে চলতে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। এখন আমি আমার মত। (বলেই নাকে সাদা পাউডার লাগিয়ে টানে)

নেশাগ্রস্ত -১ জানিস প্রতিদিন রাতে আমার বাবা-মা কাঁদেন। বলেন একমাত্র ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলাম না। বাবা বলেন ওকে 'নেশামুক্তি কেন্দ্রে' দিয়ে দিই, কিন্তু মা বলেন ওকে বাড়ি থেকে বাইরে দেবে ? আমি থাকতে পারব না। অনেক বার ভেবেছি আর নেশা করব না কিন্তু .....

সূত্রধর - কিন্তু পারছিস না, কেন ?

নেশাগ্রস্ত - কেন না ওই মানুষ গুলোকে দেখলেই গা জ্বলে যায়। যখন দেখি মঞ্চে বড় বড় আসন জুড়ে বসে আর বক্তৃতা করে। অথচ নিজের জয় নিশ্চিত করতে, ব্যাপক হারে র‍্যাগিং করাতে আমাদের প্রচুর গাঁজা, মদ যোগান দিত আর আমরা -

সূত্রধর - বুঝেছি আর বলতে হবে না। দেখ, আমাকে দেখ আমার বাবা প্রতিদিন রাতে নেশা করে বাড়ি ফিরত। আর মা কাঁদতেন। কত রাতে ভয়ে ঘুম আসত না। বাড়িতে শিক্ষক মশাই এলে মা খুব লজ্জা পেতেন। আমরাও লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে যেতাম। আর প্রতিজ্ঞা করতাম অন্যায়ের বদলে অন্যায় নয়। দেশ থেকে নেশামুক্তি ঘটাতে যা প্রয়োজন তাই করব। আয় না বন্ধু যাদের তোরা মুখোশধারী শয়তান বলিস, তাদের মুখোশ খুলে দেই। তাদের পাতানো জালে আর আটকে না থেকে সেই জাল ছিন্ন করে এদেরকে প্রতিহত করি।
(সবাইকে টেনে জড়ো করে প্রতিবাদী হওয়ার শপথ নিয়ে শোষকের মুখোশ খুলে দেওয়ার প্রয়াস নেয় একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে -)

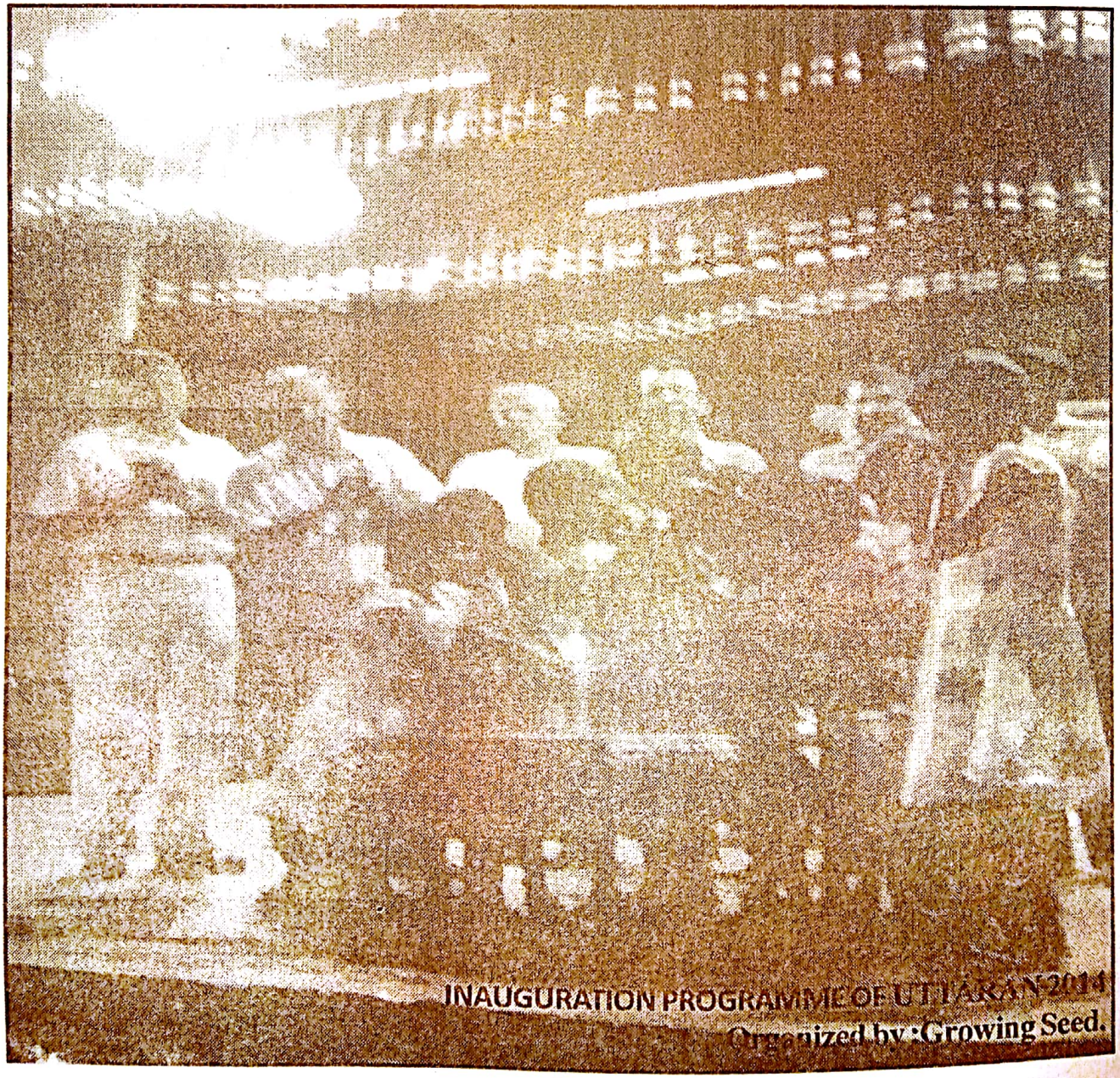
Scanned by CamScanner

কোরাস গান ধরে

বন্ধু, আর নয়, রক্ত ভেজা গোলাপের ভালবাসা,
আর নয় বসন্তের অবহেলা। বন্ধু আর নয়, আর নয় –
এবার জাল ছিন্ন হবেই
প্রতারণার মুখোশ খুলবেই
(বন্ধু) আর নয় পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকা
ঐ দেখ তোমার আসন পাকা।

বন্ধু বাড়াও হাত মেলাও পা
চলো এগিয়ে যাই,
এগিয়ে যাই
এগিয়ে যাই।

* * * *



Scanned by CamScanner

চিঠি মহল

রানা প্লাজা, বিবেকানন্দ রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
মোবাইল: ৯৪৩৬১৩২৭৩৩

শুভ বিবাহের কার্ড, আমন্ত্রণ, টিপসহ, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ কার্ডের এক বিপুল সম্ভার। এছাড়াও শ্রাদ্ধের কার্ড, সকল প্রকার চিঠিপত্র কার্ড ও মূল্যবান বিয়ের কার্ডের ডেলা।

ফ্রেন্ডস কেটারার

বিবেকানন্দ রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
মোবাইল: ৯৪৩৬৪৭১৯৩০

যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে অর্ডারের পরেও অতিরিক্তদিনের রান্না করা খাবার সরবরাহ ও পরিবেশনের মূল্য মুকুলদাসের অন্যরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

আঁকার ডালি

(আর্ট সামগ্রীর এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

বিবেকানন্দ রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
মোবাইল: ৯৮৬২৬০৯৫৪৯

M/S. STYLE N STEEL

H.O:- Kadamtala Road, Ground floor of Bank of India
Dharmanagar, North Tripura

Showroom:- Thana Road, Near SBI Bazar Branch
Dharmanagar, North Tripura

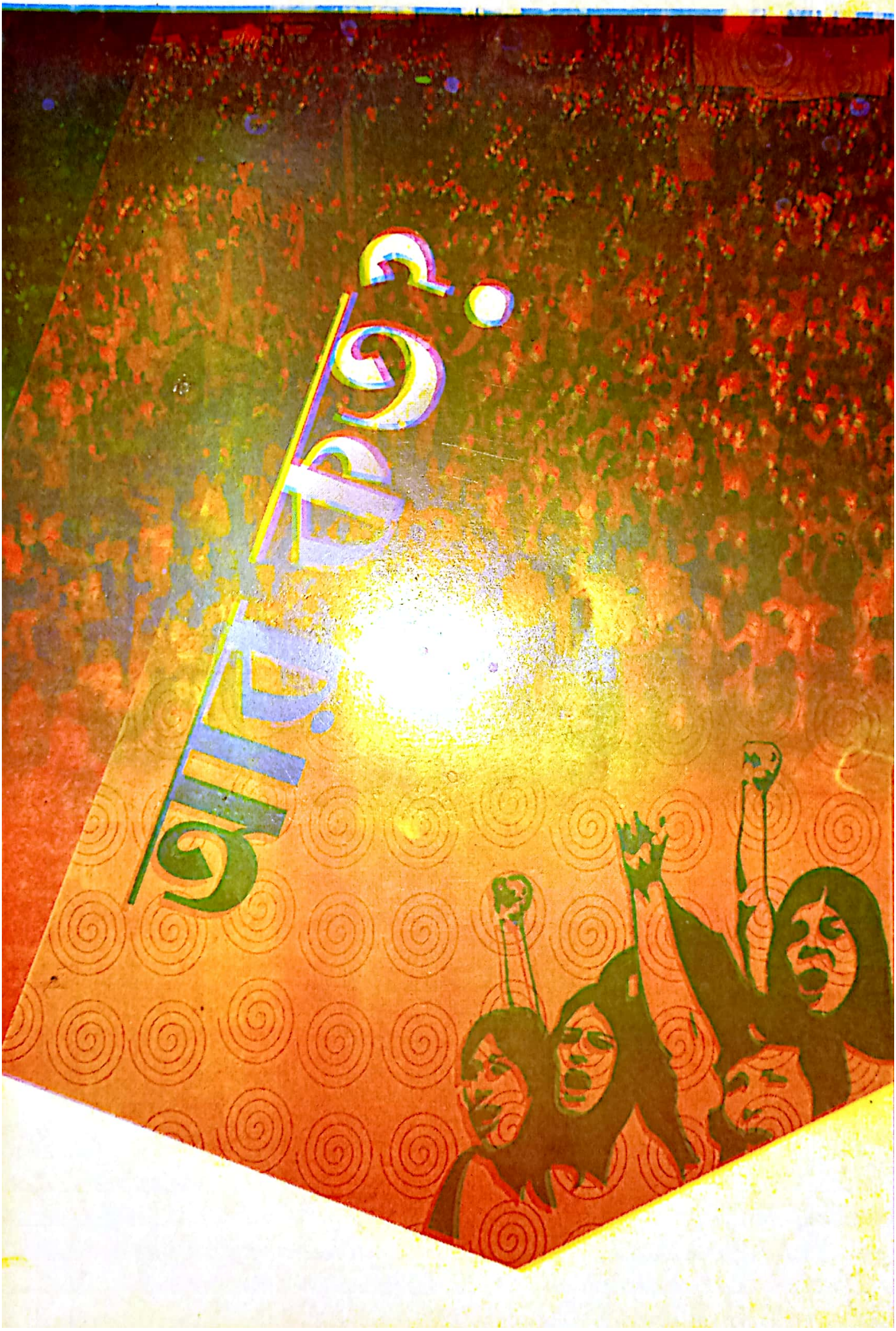
Authorized Dealer of:-

Steel n Style
A furniture brand from TATA Steelium

ZUARI FURNITURE

Sleepwell (exclusive)

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner